দারসুল কুরআন

দ্বিতীয় খন্ড

মাওলানা হামিদা পারভীন

দারসুল কুরআন

[দ্বিতীয় খণ্ড]

মাওলানা হামিদা পারভীন
কালিম হাদীস, কামিল তাফসীর, এম.এ
মুহাদ্দিস
মদীনাতুল উলূম মডেল ইনস্টিটিউট মহিলা কামিল মাদ্‌রাসা
তেজগাঁও, ঢাকা।

সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রাজ্জাক
এম, এম, এম, এ
অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই-বাইতুল মামুর
সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর, ঢাকা।

আরজু পাবলিকেশন্স
৬০/ডি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

পরিবেশনায়

ঢাকা বুক কর্ণার
৬০/ডি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল : ০১৭১১-০৩০৭১৬

খন্দকার প্রকাশনী
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১১-৯৬৬[illegible]

দারসুল কুরআন [দ্বিতীয় খণ্ড]
মাওলানা হামিদা পারভীন

প্রকাশক ঃ
মাওলানা আমীনুল ইসলাম
ঢাকা বুক কর্ণার
৬০/ডি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল : ০১৭১১-০৩০৭১৬

প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারি, ২০০৯ ইং
তৃতীয় প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ ইং

প্রচ্ছদ ঃ
মুবাশ্বির মজুমদার

মুদ্রণে ঃ
আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিরিশদাস লেন,
ঢাকা-১১০০

বিনিময় ঃ ১১০/- টাকা মাত্র।

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

পবিত্র কুরআন হলো মানুষের জীবন বিধান। মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের সঠিক পরিচয়ই কুরআনে বিবৃত হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ বস্তুত এটা মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট সতর্কবাণী এবং আল্লাহকে যারা ভয় করে তাদের জন্য এটা পথ নির্দেশ ও কল্যাণের উপদেশ। (আলে ইমরান ঃ ১৩৮) আল কুরআনের বাস্তব অনুসরনের মাধ্যমেই মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনকে শান্তি ও কল্যাণময় করে তোলতে পারে। রাসূলে পাক (স) এবং সাহাবায়ে কেরামের পুত পবিত্র জীবন ছিল আল কুরআনের সঠিক বাস্তবায়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারা পূর্ণ মর্যাদা সহকারে কুরআন অধ্যয়ন করতেন, এর মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন করতেন এবং নিজেদের জীবনে আল কুরআনের বিধানকে কার্যকর করতেন। তাই তাদের যুগ ছিল ইসলামের সোনালী যুগ। কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারনেই আজ বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠী অমুসলিমদের হাতে নির্যাতিত ও নিস্পেষিত হচ্ছে। রাসূল (স) বলেছেন ঃ "আমি তোমাদের মাঝে দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি। এ দুটিকে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আকঁড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। উহা হলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নত।" (মিশকাত, মুয়াত্তা)

অতএব আমাদেরকে অতি দ্রুতগতিতে কুরআনের দিকে ফিরে আসতে হবে। গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে। দারসুল কুরআন তারই একটি প্রয়াস মাত্র। আরবী দারস্ শব্দের অর্থ পাঠ, শিক্ষা, আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা ইত্যাদি। ইংরেজীতে যাকে (Study) বলা হয়। কুরআন স্টাডি করা না হলে, কুরআন থেকে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করা কখনো সম্ভব নয়। জীবনকে আলোকিত করার জন্য কুরআনের শিক্ষার কোন বিকল্প নাই। বইটিতে আমরা কুরআনের ব্যবহারিক অর্থ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বইটি জ্ঞান পিপাসু ভাই বোনদের কুরআনের জ্ঞান আহরণে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও মানুষকে কুরআনের দিকে আকৃষ্ট করাই এর লক্ষ্য।

বইখানা লেখায় উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন আমার স্বামী প্রবর মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রাজ্জাক। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান দিন।

গ্রন্থখানি জ্ঞান পিপাসু পাঠক-পাঠিকাদের হাতে নির্ভুলভাবে তুলে দেয়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি কোন ভুলত্রুটি কারো নজরে পড়ে তবে দয়া করে আমাদের অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ, তিনি যেন এ প্রচেষ্টা কবুল করেন এবং পরকালে আমাদের নাজাতের অসীলা করে দেন।

তারিখ ঃ ১লা জানুয়ারী, ২০০৯ইং

বিনীত

মাওলানা হামিদা পারভীন

১০, পূর্ব তেজতুরী বাজার, ঢাকা

সূচীপত্র

১

রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা প্রদান

৬. সূরা আল-আন'আম

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ১৬৫, রুকু- ২০

আলোচ্য আয়াত ঃ ৩৩-৩৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(٣٣) قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ (٣٤) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَأُوْذُواْ حَتّٰى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَإِ الْمُرْسَلِيْنَ (٣٥) وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِيْ الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِيْ السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِاٰيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلٰى الْهُدٰى فَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ (٣٦) إِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৩৩) আমি অবশ্য জানি যে, তারা যা বলে তা তোমাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়; কিন্তু তারা তোমাকে তো মিথ্যাবাদী বলে না; বরং জালিমরা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে। (৩৪) তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্যধারণ করেছিলেন যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের নিকট এসেছে। আল্লাহ্র আদেশ কেউ পরিবর্তন করতে পারে না, রাসূলগণের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট এসেছে। (৩৫) যদি তাদের বিমুখতা তোমার নিকট কষ্টকর হয় তবে পারলে ভূগর্ভে সুরঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ করো এবং তাদের নিকট থেকে কোনো নিদর্শন আনো। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে অবশ্য সৎপথে একত্রিত করতেন। সুতরাং তুমি মূর্খদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না। (৩৬) যারা শ্রবণ করে শুধু তারাই ডাকে সাড়া দেয়। আর মৃতকে আল্লাহ পুনর্জীবিত করবেন; অতঃপর তার দিকেই তারা প্রত্যাবর্তীত হবে।

শব্দার্থ ঃ قَدْ نَعْلَمُ ঃ আমি অবশ্যই জানি। إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ঃ তোমাকে নিশ্চয়ই কষ্ট দেয়। الَّذِيْ ঃ উহা। يَقُوْلُوْنَ ঃ যা তারা বলে। فَإِنَّهُمْ ঃ বস্তুত তারা। لَا يُكَذِّبُوْنَكَ ঃ তোমাকে তো মিথ্যাবাদী বলে না। وَلَٰكِنَّ ঃ বরং। الظَّالِمِيْنَ ঃ ঐ সকল জালিমেরা। بِاٰيَاتِ اللهِ ঃ আল্লাহর আয়াতকে। يَجْحَدُوْنَ ঃ অস্বীকার করে। وَلَقَدْ كُذِّبَتْ ঃ অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। رُسُلٌ ঃ অনেক রাসূলকে। مِّنْ قَبْلِكَ ঃ তোমার পূর্বেও। فَصَبَرُوْا ঃ অতঃপর তারা ধৈর্যধারণ করেছিলেন। عَلٰى مَا كُذِّبُوْا ঃ তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা সত্ত্বেও। وَأُوْذُوْا ঃ এবং কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও। حَتّٰى ঃ যে পর্যন্ত না। أَتَاهُمْ ঃ তাদের নিকট এসেছিল। نَصْرُنَا ঃ আমার

সাহায্য। وَلَا مُبَدِّلَ ঃ কোন পরিবর্তনকারী নেই। لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ঃ আল্লাহর বানী সমূহের। وَلَقَدْ আর নিশ্চয়ই তো। جَاءَكَ ঃ তোমার নিকট এসেছে। مِنْ نَّبَإِ ঃ কিছু সংবাদ। الْمُرْسَلِيْنَ ঃ রাসূলগণের। وَإِنْ كَانَ ঃ আর যদি। كَبُرَ কষ্টকর হয়। عَلَيْكَ তোমার নিকট। إِعْرَاضُهُمْ ঃ তাদের উপেক্ষা। فَإِنِ اسْتَطَعْتَ ঃ তবে আপনি সক্ষম হলে। أَنْ تَبْتَغِيَ ঃ অন্বেষন করতে। نَفَقاً ঃ সুড়ঙ্গ। فِي الْأَرْضِ ঃ ভূগর্ভে। أَوْ سُلَّماً ঃ অথবা সোপান। فِي السَّمَاءِ আকাশে। فَتَأْتِيَهُمْ ঃ অতপর তাদের নিকট নিয়ে আসুন। بِآيَةٍ ঃ কোন নিদর্শন। وَلَوْ ঃ আর যদি। شَاءَ اللّٰهُ ঃ আল্লাহ ইচ্ছা করেন। لَجَمَعَهُمْ ঃ অবশ্যই তাদেরকে একত্রিত করবেন। عَلَى الْهُدٰى ঃ সৎ পথে। فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ঃ সুতরাং আপনি হবেন না মুর্খদের অন্তর্ভূক্ত। إِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ ঃ শুধু তারাই ডাকে সাড়া দেয়। الَّذِيْنَ ঃ যারা। يَسْمَعُوْنَ ঃ শ্রবণ করে। وَالْمَوْتٰى ঃ আর মৃতদেরকে। يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ঃ আল্লাহ পুনরুজ্জীবিত করবেন। ثُمَّ ঃ অতঃপর। إِلَيْهِ ঃ তারই নিকট। يُرْجَعُوْنَ ঃ তারা প্রত্যাবর্তিত হবে।

নামকরণ ঃ اَنْعَامٌ শব্দটি আরবী ভাষায় চতুষ্পদ ও গবাদি পশু তথা উট, গাভী, ভেড়া ও ছাগল ইত্যাদি এর নর মাদী বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। অত্র সূরায় ষোড়শ ও সপ্তদশ রুকুতে গৃহপালিত চুতষ্পদ জন্তু হালাল ও হারাম হওয়া সম্পর্কে আরবদের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণার

প্রতিবাদ করা হয়েছে। এটার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ সুরাটির নামকরণ করা হয়েছে সূরা আল-আনআম। এ কথার দ্বারা এটা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে অত্র সূরায় শুধু আনআম সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে; বরং অনেক বিষয়ই আলোচিত হয়েছে, কিন্তু আনআমের আলোচনাটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাই সূরাটির নামকরণ আল আনআম হওয়া যথার্থ হয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল ঃ এ সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরা আল-আনআম মক্কা মুয়ায্যমায় একত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন তার চতুর্দিকে ৭০ হাজার ফেরেশতা ঘিরে ছিলেন এবং তারা তাসবীহ পাঠ করছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রা) এ সম্পর্কে বলেন, নবী কারীম (স) বলেছেন যে, সূরা আল-আনআম একত্রে নাযিল হয়েছে। হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন যে, এ সূরাটি যখন রাসূলে কারীম (স) এর উপর নাযিল হচ্ছিল, তখন তিনি একটি উষ্ট্রীর পিঠে আরোহী অবস্থায় ছিলেন, আর আমি সে উষ্ট্রীর লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মনে হচ্ছিল তাঁর মেরুদণ্ড এই বুঝি ভেঙ্গে যাবে। মোট কথা এ সূরার বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করলে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সূরাটি সম্ভবত নবী কারীম (সা) এর মক্কী জীবনের শেষভাগে নাযিল হয়েছে।

নাযিল হওয়ার উপলক্ষ ঃ হযরত মুহাম্মদ (স) যখন মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করলেন তখন থেকে বারটি বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। কুরাইশদের প্রতিবন্ধকতা, জুলুম ও নির্যাতন চরমে পৌছে গিয়েছিল। ইসলাম গ্রহণকারীদের একটি অংশ তাদের অত্যাচার নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে দেশ ত্যাগ করে হাবশায় হিজরত করেছিল। হযরত মুহাম্মাদ (স) কে সাহায্য, সহানুভূতি ও সমর্থন করার জন্য আবু তালিব বা হযরত খাদিজা (রা) কেহই বেচেঁ ছিলেন না। ফলে সব রকমের পার্থিব সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি কঠোর প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রচার ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। তাঁর ইসলাম প্রচারের প্রভাবে মক্কা ও চারপাশের গোত্রীয় উপজাতিদের মধ্য থেকে সৎ লোকেরা একের পর এক ইসলাম গ্রহণ করে চলছিল। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে

সমগ্র জাতি ইসলামকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের গোঁয়ার্তুমি অব্যাহত রেখেছিল। কোথাও কোন ব্যক্তি ইসলামের দিকে সামান্যতম ঝোঁক প্রকাশ করলেও তার পেছনে ধাওয়া করা হতো। তাকে তিরস্কার, গালিগালাজ করা হতো। শারীরিক দুর্ভোগ ও অর্থনৈতিক, সামাজিক নিপীড়নে তাকে জর্জরিত করা হতো। এ অন্ধকার বিভীষিকাময় পরিবেশে একমাত্র ইয়াসরেবের দিক থেকে একটি হালকা আশার আলো দেখা দিয়ে ছিল। সেখানকার আওস ও খাযরাজ গোত্রের প্রভাবশালী লোকেরা এসে নবী কারীম (সা) এর হাতে বায়আত করে গিয়েছিলেন। সেখানে কোন প্রকার আভ্যন্তরীণ বাধা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হয়েই ইসলাম প্রসার লাভ করতে শুরু করেছিল। কিন্তু একটি ছোট প্রারম্ভিক বিন্দুর মধ্যে ভবিষ্যতের যে বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল তা কোন স্থূলদর্শীর দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়া সম্ভবপর ছিল না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হত ইসলাম একটি দুর্বল আন্দোলন। এর পেছনে কোন বৈষয়িক ও বস্তুগত শক্তি নেই। এর আহ্বায়কের পেছনে তাঁর পরিবারের ও বংশের দুর্বল ও ক্ষীণ সাহায্য-সমর্থন ছাড়া আর কোন কিছুই নেই। মুষ্টিমেয় অসহায় ও বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করেছে। যেন মনে হয় নিজেদের জাতির বিশ্বাস, মত ও পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে তারা সমাজ থেকে এমন ভাবে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে যেমন গাছের মরা পাতা মাটির ওপর ঝড়ে পড়ে।

আলোচ্য বিষয়

এহেন পটভূমিতে এ ভাষণটি নাযিল হয়। এ হিসেবে এখানে আলোচ্য বিষয়গুলোকে প্রধান সাতটি শিরোনামে ভাগ করা যেতে পারে।

এক ঃ শিরককে খন্ডন করা ও তাওহীদ বিশ্বাসের দিকে আহ্বান জানানো।

দুইঃ আখেরাত বিশ্বাসের প্রচার এবং এ দুনিয়ার জীবনটাই সবকিছু এ ভুল চিন্তার অপনোদন।

তিন ঃ জাহেলীয়াতের যে সমস্ত ভ্রান্ত কাল্পনিক বিশ্বাস ও কুসংস্কারে লোকেরা ডুবে ছিল তার প্রতিবাদ করা।

চার ঃ যেসব বড় বড় নৈতিক বিধানের ভিত্তিতে ইসলাম তার সমাজ কাঠামো গড়ে তুলতে চায় সেগুলো শিক্ষা দেয়া।

পাঁচ ঃ নবী (স) ও তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত লোকদের বিভিন্ন আপত্তি ও প্রশ্নের জবাব।

ছয় ঃ সুদীর্ঘ প্রচেষ্টা ও সাধনা সত্ত্বেও দাওয়াত ফলপ্রসূ না হবার কারণে নবী (স) ও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যে অস্থিরতা ও হতাশাজনক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছিল সে জন্য তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া।

সাত ঃ অস্বীকারকারী ও বিরোধী পক্ষকে তাদের গাফলতি, বিহ্বলতা ও অজ্ঞানতা প্রসূত আত্মহত্যার কারণে উপদেশ দেয়া, ভয় দেখানো ও সতর্ক করা।

মক্কী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়

নবী (স) এর মক্কী জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা ইসলামী দাওয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে একে চারটি প্রধান ও উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে বিভক্ত দেখতে পাই।

প্রথম পর্যায় ঃ নবুওয়াত প্রাপ্তির সূচনা থেকে শুরু করে নবুওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণা পর্যন্ত প্রায় তিন বছর। এ সময় গোপনে দাওয়াত দেবার কাজ চলে। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়। মক্কার সাধারণ লোকেরা এ সম্পর্কে তখনো কিছুই জানতো না।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ নবুওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষনার পর থেকে জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন ও উৎপীড়নের সূচনাকাল পর্যন্ত প্রায় দু' বছর। এ সময় প্রথমে বিরোধিতা শুরু হয়। তারপর তা প্রতিরোধের রূপ নেয়। এরপর ঠাট্টা, বিদ্রূপ উপহাস, দোষারোপ, গালিগালাজ, মিথ্যা প্রচারণা এবং জোটবদ্ধভাবে বিরোধিতা করার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এমনকি শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। যারা তুলনামুলকভাবে বেশী গরীব, দুর্বল ও আত্মীয় বন্ধনহীন ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে তারাই হয় সর্বাধিক নির্যাতনের শিকার।

তৃতীয় পর্যায় ঃ চরম উৎপীড়নের সূচনা অর্থাৎ নবুওয়াতের ৫ম বছর থেকে নিয়ে আবু তালিব ও হযরত খাদীজা (রা) এর ইন্তিকাল পর্যন্ত পাঁচ বছর সময়কাল পর্যন্ত এ পর্যায়টি বিস্তৃত। এ সময়ে বিরোধিতা চরম আকার

ধারণ করতে থাকে। মক্কার কাফেরদের জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক মুসলমান আবিসিনিয়া হিজরত করে। নবী (স) তাঁর পরিবারবর্গ ও অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কট করা হয়। রাসূল (স) তাঁর সমর্থক ও সংগী সাথীদের নিয়ে আবু তালিব গিরিবর্তে অবরুদ্ধ হন।

চতুর্থ পর্যায় ঃ নবুওয়াতের দশম বছর থেকে ত্রয়োদশ বছর পর্যন্ত প্রায় তিন বছর। এটি ছিল নবী (স) ও তাঁর সাথীদের জন্য সবচেয়ে কঠিন ও বিপজ্জনক সময়। তার জন্য মক্কায় জীবন যাপন করা কঠিন করে দেয়া হয়েছিল। তায়েফে গেলেন সেখানেও আশ্রয় পেলেন না। হজ্জের সময় আরবের প্রতিটি গোত্রকে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ ও তাকে সাহায্য করার আবেদন জানালেন। কিন্তু কোথাও সাড়া পেলেন না। এদিকে মক্কাবাসীরা তাকে হত্যা করার, বন্দী করার বা নগর থেকে বিতাড়িত করার জন্য সলা-পরামর্শ করেই চলছিল। অবশেষে আল্লাহর অপার অনুগ্রহে আনসারদের হৃদয় দুয়ার ইসলামের জন্য খুলে গেলো। তাদের আহ্বানে তিনি মদীনায় হিজরত করলেন। (তাফহীম)

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল

(১) হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, একবার আবু জাহল রাসূলে কারীম (স) কে লক্ষ্য করে বলল, আমরা তোমাকে অবিশ্বাস করি না। কেননা তুমি কোনো দিন মিথ্যা বলোনি। তবে তোমার আনীত ধর্ম বিশ্বাস করতে পারছি না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা নবী কারীম (স) কে সান্ত্বনা দিয়ে আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

(২) বদর যুদ্ধের সময় আখনাস ইবনে শারীক নামক জনৈক মুনাফেক আবু জাহলকে লক্ষ্য করে বলল, হে আবুল হাকাম এ মূহুর্তে আমি আর তুমি ছাড়া এখানে কেউ নেই। সুতরাং সত্য করে বল তো, মুহাম্মদ যা বলে তা কি সত্য, না মিথ্যা। আবু জাহল বলল, আল্লাহ তাআলার শপথ করে বলছি, তাঁর কথা একটিও মিথ্যা নয়। তবে আমরা তাঁকে মেনে নিতে পারছি না। কারণ সমাজের নেতৃত্ব দান, হজ্জের মৌসূমে পানি সরবরাহ করা ও কা'বা ঘরের চাবি সংরক্ষণ করা ইত্যাদি সব ক'টি মর্যাদাই বুন কুসাই এর

হস্তগত। নবুয়তও যদি তাদের হস্তগত হয়ে যায়, তাহলে কুরাইশের অন্যান্য গোত্রগুলোর হাতে কিছুই থাকে না। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ

অনুবাদ

আমি অবশ্য জানি যে, তারা যা বলে তা তোমাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়; কিন্তু তারা তোমাকে তো মিথ্যাবাদী বলে না; বরং জালিমরা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যতদিন পর্যন্ত মুহাম্মদ (স) তাঁর জাতিকে আল্লাহর আয়াত শুনাতে শুরু করেননি ততদিন তারা তাকে "আল আমীন" বা সত্যবাদী মনে করতো এবং তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতো। যখন তিনি তাদেরকে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে শুরু করলেন তখন থেকেই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করলো। মক্কী জীবনে নবুয়্যাতের দ্বিতীয় পর্যায়েও তাদের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলার সাহস করতে পারতো। তার কোন কট্টর বিরোধী তাঁর বিরুদ্ধে কখনো এ ধরণের দোষারোপ করেনি যে, দুনিয়াবী ব্যাপারে তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেছেন। নবী হওয়ার কারণ এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করার জন্যই তারা তাকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল আবু জাহল। হযরত আলীর (রা) বর্ণনা মতে একবার আবু জাহল নিজেই নবী (স) এর সাথে আলাপ প্রসঙ্গে বলে ঃ

إِنَّا لاَ نُكَذِّبُكَ وَلَكِنْ نُكَذِّبُكَ مَا جِئْتَ بِهِ

"আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না বরং আপনি যা কিছু পেশ করছেন সেগুলোকেই মিথ্যা বলছি"।

আলোচ্য আয়াতে কাফির-মুশরিকদের কুফরি উক্তিতে রাসূল (স) এর মনে খুবই ব্যথার উদ্রেক হতো, তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও অস্থির হয়ে যেতেন, তাই আল্লাহ তাআলা রাসূল (স) কে সান্ত্বনা প্রদান করে ইরশাদ করেছেন, আমার ভালো জানা আছে যে, তাদের (কাফিরদের) উক্তি আপনাকে দুঃখিত করে। অতএব আপনি দুঃখিত হবেন না; বরং তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কাছে সোপর্দ করুন। কেননা তারা সরাসরি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না। কিন্তু জালিমরা আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলী ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করে যদিও এতে অপরিহার্যভাবে আপনাকেই মিথ্যাবাদী বলা হয়ে যায়, কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যারোপ করা। যেমন তাদের কেউ কেউ অর্থাৎ আবু জাহল প্রমুখ একথা স্বীকারও করে। তাদের আসল উদ্দেশ্য যখন আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, তখন বুঝতে হবে যে, তাদের ব্যাপারটি আল্লাহ তাআলার সাথেই সম্পৃক্ত। তিনি নিজেই তাদেরকে বুঝে নেবেন। আপনি দুঃখিত হবেন কেন?

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوْذُواْ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَإِ الْمُرْسَلِيْنَ

অনুবাদ

তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল; কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্যধারণ করেছিলেন যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের নিকট এসেছে। আল্লাহর আদেশ কেউ পরিবর্তন করতে পারে না, রাসূলগণের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট এসেছে।

উক্ত আয়াতে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের ইতিহাস বর্ণনা করে রাসূল (স) কে সান্ত্বনা প্রদানসহ ধৈর্য ও সহনশীলতার উপদেশ প্রদান করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, আর কাফিরদের এ মিথ্যারোপ করা ব্যাপারটি নতুন কিছু না; বরং আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরের প্রতিও মিথ্যারোপ করা হয়েছে, আর এ মিথ্যারোপের জবাবে তারা ধৈর্যই ধরেছিলেন এবং তাদের উপর নানাবিধ নির্যাতন চালানো হয়; এমনকি তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে যায়। ফলে বিরোধী পক্ষ পরাজিত হয় তখন পর্যন্ত তারা ধৈর্যই ধরেছিলেন। সুতরাং এমনিভাবে ধৈর্য ধরার পর আপনার কাছেও আল্লাহ তাআলার সাহায্য পৌঁছবে। কেননা, আল্লাহ তাআলার বাণী অর্থাৎ ওয়াদাসমূহকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার সাথেও সাহায্যের ওয়াদা হয়ে গেছে। যেমন বলা হয়েছে- لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ আপনার কাছে পয়গম্বরদের কোনো কোনো কাহিনীর মাধ্যমে পৌঁছেছে যদ্দারা আল্লাহ তাআলার সাহায্য এবং পরিণামে বিরোধী পক্ষের পরাজয় প্রমাণিত হয়।

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِيْ الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِيْ السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ

অনুবাদ

যদি তাদের বিমুখতা তোমার নিকট কষ্টকর হয় তবে পারলে ভূগর্ভে সুরঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ করো এবং তাদের নিকট থেকে কোনো নিদর্শন আনো। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে অবশ্য সৎপথে একত্রিত করতেন। সুতরাং তুমি মূর্খদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কাফিরদের অবাঞ্ছিত দাবির উত্তরে হুযুর (স) কে দৃঢ়তার সাথে ধৈর্যধারণের নির্দেশ প্রদান করে বলেন, এবং যদি তাদের (অবিশ্বাসীদের) বিমুখতা আপনার পক্ষে কষ্টকর হয় এবং তাই মনে চায় যে, তাদের ফরমায়েশকৃত মুজিযা প্রকাশিত হোক তবে আপনি যদি ভূতলে যাওয়ার জন্য কোন সুরঙ্গ অথবা আকাশে উঠার জন্য কোন সিড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন এবং তার দ্বারা ভূতলে কিংবা আকাশে গিয়ে সেখান থেকে কোনো একটি ফরমায়েশী মু'জিযা আনতে পারেন, তবে ভালো কথা, আপনি তাই আনুন। অর্থাৎ আমি তো তাদের এসব ফরমায়েশ প্রয়োজন ও হিকমত অনুযায়ী না হওয়ার কারণে পূর্ণ করব না। আপনি যদি চান যে, তারা কোন না কোনোরূপে মুসলমান হোক, তবে আপনি নিজে এর ব্যবস্থা করুন। আর আল্লাহ সৃষ্টিগতভাবে ইচ্ছা করলে তাদের সবাইকে সৎপথে একত্রিত করতেন। কিন্তু যেহেতু তারা নিজেরাই নিজেদের মঙ্গল চায় না, তাই সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করেননি। এমতাবস্থায় আপনার চাওয়া ঠিক হবে না। অতএব আপনি এ চিন্তা পরিহার করুন, আপনার চিন্তার পরিশুদ্ধি আনতে হবে। আপনি তাই করুন, অবুঝদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না।

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

অনুবাদ

যারা শ্রবণ করে শুধু তারাই ডাকে সাড়া দেয়। আর মৃতকে আল্লাহ পুনর্জীবিত করবেন; অতঃপর তার দিকেই তারা প্রত্যাবর্তিত হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ আয়াতে যাদের অন্তর জীবন্ত এবং যাদের অন্তরে সদিচ্ছা রয়েছে তারাই ইসলামের দাওয়াত কবুল করে, সে প্রসঙ্গে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, সত্য ও হিদায়েতকে তো তারাই গ্রহণ করে যারা সত্য বিষয়কে অনুসন্ধিৎসার সাথে শ্রবণ করে এবং এ অস্বীকার ও বিমুখতার পূর্ণ শাস্তি ইহকালে না পেলে তাতে কি হলো, একদিন আল্লাহ মৃতদেরকে কবর থেকে

জীবিত করে উত্থিত করবেন, অতপর তারা সবাই আল্লাহরই দিকে হিসাবের জন্য প্রত্যাবর্তিত হবে।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর আমি ভাল ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদেরকে পরীক্ষা করছি। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে আমার দিকেই ফিরে আসতেহবে। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৩৫)

শিক্ষা

১. রাসূলকে কষ্ট দেয়া ও মিথ্যাবাদী বলা হচ্ছে আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করার নামান্তর।

২. ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দেয়া চিরাচরিত প্রথা।

৩. এ পথে মিথ্যা অভিযোগ, কষ্ট-ক্লেশ, বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

৪. সকলকে আল্লাহর পথে একই সময় একত্রিত করা যাবে না।

৫. মৃত্যুর পরে আমাদের সকলকেই পুনর্জীবিত করা হবে এবং তারই নিকট ফিরে যেতে হবে।

২

আল্লাহর পথে দাওয়াত

১৬. সূরা আন-নাহল

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত-১২৮, রুকু-১৬

আলোচ্য আয়াত ঃ ১২৫-১২৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(١٢٥) اُدْعُ إِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ (١٢٦) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ (١٢٧) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّٰهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ (١٢٨) إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (১২৫) হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো

সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। তোমার রবই বেশি ভাল জানেন কে তাঁর পথচ্যুত হয়ে আছে এবং কে আছে সঠিক পথে। (১২৬) আর যদি তোমরা প্রতিশোধ নাও, তাহলে ঠিক ততটুকু নাও যতটুকু তোমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা সবর করো তাহলে নিশ্চিতভাবেই এটা সবরকারীদের পক্ষে উত্তম। (১২৭) হে মুহাম্মদ সবর অবলম্বন করো। আর তোমার এ সবর আল্লাহরই সুযোগ দানের ফলমাত্র। এদের কার্যকলাপে দুঃখ করো না এবং এদের চক্রান্তের কারণে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না। আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।

শব্দার্থ ঃ اُدْعُ ঃ তুমি আহ্বান কর। اِلٰى ঃ দিকে। سَبِيْلِ ঃ পথে। رَبِّكَ তোমার রবের। بِالْحِكْمَةِ হিকমতের সাথে। وَالْمَوْعِظَةِ ঃ ও উপদেশ। الْحَسَنَةِ ঃ উত্তম। وَ এবং। جَادِلْهُم ঃ তাদের যুক্তি দাও। بِالَّتِيْ ঃ এমন উপায়ে। هِيَ ঃ যা। أَحْسَنُ ঃ অতি উত্তম। إِنَّ ঃ নিশ্চয়। رَبَّكَ ঃ তোমার রব। هُوَ ঃ তিনি। أَعْلَمُ ঃ অধিক জানেন। بِمَنْ ঃ সম্বন্ধে। ضَلَّ ঃ ভ্রষ্ট হয়েছে। عَنْ ঃ থেকে। سَبِيْلِهِ ঃ তাঁর পথে। وَ ঃ এবং। هُوَ ঃ তিনি। أَعْلَمُ ঃ খুব জানেন। بِالْمُهْتَدِيْنَ ঃ হেদায়াত প্রাপ্তদেরকে। وَ ঃ এবং। إِنْ ঃ যদি। عَاقَبْتُمْ ঃ তোমরা প্রতিশোধ নাও। فَعَاقِبُواْ ঃ তোমরা তবে প্রতিশোধ নিবে। بِمِثْلِ ঃ সমান। مَا ঃ (তার) যা। عُوْقِبْتُمْ ঃ তোমাদের কষ্ট দেয়া হয়েছে। بِهِ ঃ তার সাথে। وَ ঃ কিন্তু। لَئِنْ ঃ অবশ্যই। صَبَرْتُمْ ঃ তোমরা সবর কর। لَهُوَ ঃ অবশ্যই তা। خَيْرٌ ঃ উত্তম। لِّلصَّابِرِيْنَ ঃ সবরকারীদের জন্য। وَ ঃ আর। اصْبِرْ ঃ তুমি সবর কর। وَ ঃ এবং। مَا ঃ না। صَبْرُكَ ঃ তোমার ধৈর্য। إِلاَّ ঃ

ব্যতিত। بِـاللهِ ঃ (তাওফীক) আল্লাহর। وَ ঃ এবং। لاَ تَحْـزَنْ ঃ দুঃখ করো

না। عَلَيْهِمْ ঃ তাদের উপর। وَ ঃ এবং। لاَ تَـكُ ঃ তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়ো না।

فِـي ঃ মধ্যে। ضَـيْقٍ ঃ সংকীর্ণতা। مِّمَّـا ঃ তাতে। يَمْكُـرُوْنَ ঃ তারা ষড়যন্ত্র

করেছে। إِنَّ ঃ নিশ্চয়ই। اللهَ ঃ আল্লাহ। مَـعَ ঃ তাদের সাথে। الَّـذِيْنَ ঃ

যারা। اتَّقَـوْا ঃ তাকওয়া অবলম্বন করে। وَّ ঃ এবং। الَّـذِيْنَ ঃ যারা। هُـم ঃ

তারা। مُّحْسِنُوْنَ সৎকর্মপরায়ণ।

সূরার নামকরণ ঃ অত্র সূরার ৬৮ নং আয়াতের وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْـلِ 'নাহল' শব্দ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। 'নাহল' শব্দের অর্থ মৌমাছি।

নাযিল হওয়ার সময় কাল

এ সূরাটি মহানবী (স)-এর মক্কী জীবনের শেষের দিকে নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

শিরককে বাতিল করে দেয়া, তাওহীদকে প্রমাণ করা, নবীর আহ্বানে সাড়া না দেবার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা ও উপদেশ দেয়া এবং হকের বিরোধিতা ও তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন করা এ সূরার মূল বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়।

আলোচনা ঃ কোন ভূমিকা ছাড়াই আকস্মিকভাবে একটি সতর্কতামূলক বাক্যের সাহায্যে সূরার সূচনা করা হয়েছে। মক্কায় কাফেররা বারবার বলতো, "আমরা যখন তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছি এবং প্রকাশ্যে তোমার বিরোধিতা করছি তখন তুমি আমাদের আল্লাহর যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো তা আসছে না কেন? তাদের এ কথাটি বার বার বলার কারণ ছিল এই যে, তাদের মতে এটিই ছিল মুহাম্মদ (স) এর নবী না হওয়ার সবচেয়ে বেশী সুস্পষ্ট প্রমাণ। এর জবাবে বলা হয়েছে, নির্বোধের দল, আল্লাহর

আযাব তো তোমাদের মাথার উপর একেবারে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন তা কেন দ্রুত তোমার উপর নেমে পড়ছে না এ জন্য হৈ চৈ করো না। বরং তোমরা যে সামান্য অবকাশ পাচ্ছো তার সুযোগ গ্রহণ করে আসল সত্য কথাটি অনুধাবন করার চেষ্টা কর। অতপর নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু একের পর এক স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

১. হৃদয়গ্রাহী যুক্তি এবং জগত ও জীবনের নিদর্শনসমূহের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে বুঝানো হয়েছে যে, শিরক মিথ্যা এবং তাওহীদই সত্য।

২. অস্বীকারকারীদের সন্দেহ, সংশয়, আপত্তি, যুক্তি ও টালবাহানার প্রত্যেকটির জবাব দেয়া হয়েছে।

৩. মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরার গোয়ার্তুমি এবং সত্যের মোকাবিলায় অহংকার ও আস্ফালনের অশুভ পরিণামের ভয় দেখানো হয়েছে।

৪. মুহাম্মদ (স) যে জীবন ব্যবস্থা এনেছেন, মানুষের জীবনে যে সব নৈতিক ও বাস্তব পরিবর্তন সাধন করতে চায় সেগুলো সংক্ষেপে কিন্তু হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসংগে মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে, তারা যে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেবার দাবী করে থাকে এটা নিছক বাহ্যিক ও অন্তসারশূন্য দাবী নয় বরং এর বেশ কিছু চাহিদাও রয়েছে। তাদের আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক-চারিত্রিক ও বাস্তব জীবনে এগুলোর প্রকাশ হওয়া উচিত।

৫. নবী (স) ও তাঁর সংগী সাথীদের মনে সাহস সঞ্চার করা হয়েছে এবং সংগে সংগে কাফেরদের বিরোধিতা, প্রতিরোধ সৃষ্টি ও জুলুম-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতি কি হতে হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে। (তাফহীম)

আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

অনুবাদ

হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। তোমার রবই বেশি ভাল জানেন কে তাঁর পথচ্যুত হয়ে আছে এবং কে আছে সঠিক পথে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

কথা বার্তার দিক দিয়ে সে ব্যক্তির চাইতে উত্তম কে হবে, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়? বর্ণনায় বিষয়টিকে কোন সময় دَعَـوْتُ اِلَى اللهِ কোন সময় دَعَـوْتُ اِلَى الْخَيْـرِ এবং কোন কোন সময় دَعَـوْتُ اِلَى سَـبِيْلِ اللهِ শিরোনাম দেয়া হয়। সবগুলোর সারমর্ম এক। কেননা, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার দ্বারা তাঁর দীন এবং সরল পথের দিকেই দাওয়াত দেয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

اِلَى سَـبِيْلِ رَبِّـكَ এতে আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুণ رب (পালনকর্তা) উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রতি এর সম্বন্ধ করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, দাওয়াতের কাজটি লালন ও পালনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। আল্লাহ তাআলা যেমন তাকে পালন করেছেন, তেমনি তাঁরও প্রতিপালনের ভঙ্গিতে দাওয়াত দেয়া উচিত। এতে প্রতিপক্ষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এমন পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে তার উপর চাপ সৃষ্টি না হয় এবং অধিকার ক্রিয়াশীল হয়। স্বয়ং দাওয়াত শব্দটিও এই কর্ম প্রকাশ করে। কেননা, পয়গম্বরের দায়িত্ব শুধু বিধি বিধান পৌঁছে দেয়া ও শুনিয়ে দেয়াই নয়; বরং লোকদেরকে তা পালন করার দাওয়াত দেয়াও বটে। যে ব্যক্তি কাউকে দাওয়াত দেয়, সে তাকে এমন সম্বোধন করে না, যাতে তার মনে বিরক্তি ও ঘৃণা জন্মে অথবা তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও তামাশা করে না।

بِالْحِكْمَةِ 'হিকমত' শব্দটি কুরআন পাকে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এস্থলে কোন কোন তাফসীরবিদ হিকমতের অর্থ কুরআন, কেউ কেউ কুরআন ও সুন্নাহ এবং কেউ কেউ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ স্থির করেছেন। রুহুল মাআনী ও বাহরেমুহীতের তফসীর নিম্নরূপ ঃ

إِنَّهَا الْكَلَامُ الصَّوَابُ الْوَاقِعُ مِنَ النَّفْسِ اَجْمَلَ مَوْقَعٍ

অর্থাৎ এমন বিশুদ্ধ বাক্যকে হিকমত বলা হয়, যা মানুষের মনে আসন করে নেয়। এ তাফসীরের মধ্যে সব উক্তি সন্নিবেশিত হয়ে যায়। রূহুল বয়ানের গ্রহন্থকারও প্রায় এই অর্থটিই এরূপ ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ 'হিকমত বলে সে অন্তর্দৃষ্টিকে বোঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ অবস্থার তাগিদ জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কথা বলে। এমন সময় ও সুযোগ খুজে নেয় যে, প্রতিপক্ষের উপর বোঝা হয় না। নম্রতার স্থলে নম্রতা এবং কঠোরতার স্থলে কঠোরতা অবলম্বন করে। যেখানে মনে করে যে, স্পষ্টভাবে বললে প্রতিপক্ষ লজ্জিত হবে সেখানে ইঙ্গিতে কথা বলে কিংবা এমন ভঙ্গি অবলম্বন করে, যদ্দরুন প্রতিপক্ষ লজ্জার সম্মুখীন হয় না এবং তার মনে একগুঁয়েমি ভাবও সৃষ্টি হয় না।'

والموعظة- موعظة ও وعظ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন শুভেচ্ছামূলক কথা এমনভাবে বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্যে নরম হয়ে যায়। উদাহরণতঃ তার কাছে কবুল করার সওয়াব ও উপকারিতা এবং কবুল না করার শাস্তি ও অপকারিতা বর্ণনা করা। (কামুস, মুফরাদাতে-রাগিব)

اَلْحَسَنَةُ এর অর্থ বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর নিশ্চিত হয়ে যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে আপনার কোন স্বার্থ নেই- শুধু তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলেছেন।

দাওয়াত দেবার সময় দুটি জিসিসের প্রতি নজর রাখতে হবে।

এক. প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা।

দুই. সদুপদেশ।

জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার মানে হচ্ছে, নির্বোধদের মত চোখ বন্ধ করে দাওয়াত প্রচার করবে না বরং বুদ্ধি খাটিয়ে যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার মন-মানস, যোগ্যতা ও অবস্থার প্রতি নজর রেখে এবং এ সঙ্গে পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে কথা বলতে হবে। একই লাঠি দিয়ে সবাইকে তাড়িয়ে নেয়া যাবে না। যে কোন ব্যক্তি বা দলের মুখোমুখি হলে প্রথমে তার রোগ নির্ণয় করতে হবে, তারপর এমন যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তার রোগ নিরসনের চেষ্টা করতে হবে যা তার মন মস্তিষ্কের গভীরে প্রবেশ করে তার রোগের শিকর উপড়ে ফেলতে পারে।

সদুপদেশের দুই অর্থ হয়

এক. যাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে তাকে শুধুমাত্র যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তৃপ্ত করে দিয়ে ক্ষান্ত হলে চলবে না বরং তার আবেগ-অনুভূতির প্রতিও আবেদন জানাতে হবে। দুষ্কৃতি ও ভ্রষ্টতাকে শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে বাতিল করলে হবে না বরং মানুষের প্রকৃতিতে এসবের বিরুদ্ধে যে জন্মগত ঘৃণা রয়েছে তাকেও উদ্দীপিত করতে হবে এবং সেগুলোর অশুভ পরিণতির ভয় দেখাতে হবে। ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ ও সৎকাজে আত্মনিয়োগ শুধু যে ন্যায়সংগত ও মহৎ গুণ, তা যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করলে চলবে না বরং সেগুলোর প্রতি আকর্ষণও সৃষ্টি করতে হবে।

দুই. উপদেশ এমনভাবে দিতে হবে যাতে আন্তরিকতা ও মঙ্গলাকাঙ্খা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যাকে উপদেশ দান করা হচ্ছে সে যেন একথা মনে না করে যে, উপদেশ দাতা তাকে তাচ্ছিল্য করছে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির স্বাদ নিচ্ছে বরং সে অনুভব করবে উপদেশদাতার মনে তার সংশোধনের প্রবল আকাঙ্খা রয়েছে এবং আসলে সে তার ভাল চায়।

বিতর্কের পদ্ধতি

এটি যেন নিছক বিতর্ক, বুদ্ধির লড়াই ও মানসিক ব্যায়াম পর্যায়ের না হয়। এ আলোচনায় পেঁচিয়ে কথা বলা, মিথ্যা দোষারোপ ও রূঢ় বাক্যবাণে বিদ্ধ করার প্রবণতা যেন না থাকে। প্রতিপক্ষকে চুপ করিয়ে দিয়ে নিজের গলাবাজী করে যেতে থাকা এর উদ্দেশ্যে হবে না। বরং এ বিতর্ক আলোচনায় মধুর বাক্য ব্যবহার করতে হবে। উন্নত পর্যায়ের ভদ্র আচরণ

করতে হবে। যুক্তি-প্রমাণ হতে হবে ন্যায়সঙ্গত ও হৃদয়গ্রাহী যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে তার মনে যেন জিদ, একগুয়েমী এবং কথার প্যাঁচ সৃষ্টি হবার অবকাশ না দেখা দেয়। সোজাসুজি তাকে কথা বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে এবং যখন মনে হবে যে, সে কূটতর্কে লিপ্ত হতে চাচ্ছে তখনই তাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দিতে হবে, যাতে ভ্রষ্টতার নোংরা কাদামাটি সে নিজের গায়ে আরো বেশী করে মেখে নিতে পারে। (তাফহীম)

দাওয়াত অর্থ ঃ দাওয়াত (دعوة) আরবী শব্দ। এর মূল ধাতু (دعا) এর অর্থ হচ্ছে ডাকা, আহ্বান করা, আমন্ত্রণ জানানো। আর পারিভাষিক অর্থে আল্লাহর দীনের পথে আহ্বান করাকে দাওয়াত বলে।

দাওয়াতের লক্ষ্য ঃ দাওয়াতে হকের উদ্দেশ্য "আল্লাহর বান্দাদের জীবন ও কার্যক্রম সংশোধন করা।" (সূরা আবাসা টীকা, ২. তাফহীমুল কুরআন)

দাওয়াতের মূলনীতি ঃ দাওয়াতের মূলনীতি দু'টি। যথা

১. হিকমত;
২. উপদেশ। (তাফসীরে রুহুল মাআনী)

দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি ঃ বর্তমানে যুগের চাহিদা মোতাবেক প্রযুক্তিগত বিষয় বিবেচনা করে বিভিন্ন উপায়, উপকরণ ও পদ্ধতির মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ করা যেতে পারে। দাওয়াতে দীনের কাজ প্রধানতঃ তিন ভাবে করা যায়। যথা

১. দীনি উপদেশের মাধ্যমে;
২. ইসলামী বই-পুস্তক রচনা ও প্রচারের মাধ্যমে;
৩. শিক্ষাদানের মাধ্যমে।

১. দীনি উপদেশের মাধ্যমে দীনের দাওয়াত দেয়া প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। এ কাজ না করলে ব্যক্তি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ও সমাজের লোকেরা সমষ্টিগতভাবে দায়ী থাকবেন। এ পর্যায়ে দাওয়াতকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা

ক. ব্যক্তিগত দাওয়াত, খ. সমষ্টিগত দাওয়াত।

২. দাওয়াতদাতার গুণাবলী

আল্লাহর মনোনীত দীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য দুনিয়াতে অসংখ্য নবী রাসূল এসেছেন। দুনিয়াতে যত নবী রাসূল এসেছেন তাদের সকলকেই দীনের এ কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। ইহা একটি মহান ও পবিত্র দায়িত্ব। কাজেই এ দায়িত্ব পালন করতে হলে তাদেরকে বেশ কিছু গুণ অর্জন করতে হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা গেল।

১. ইলমের অধিকারী হওয়া ঃ ব্যক্তি যে মহাসত্যের প্রতি মানুষকে আহ্বান করবেন, সে সম্পর্কে তার পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। যেহেতু তিনি আল্লাহর দীনের প্রতি মানুষকে আহ্বান করবেন তাই তাকে কুরআন হাদীস গভীরভাবে অধ্যয়ন করে আল্লাহর দীন সম্পর্কেও সম্যক ধারণা রাখতে হবে।

আল্লাহর বাণী ঃ তাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে একদল লোক দীন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে জানার জন্য কেন বের হয় না, যাতে করে তারা নিজ নিজ গোত্রে ফিরে এসে সতর্ক করতে পারে, তখন সম্ভবত তাদের গোত্রের লোকেরা সাবধান হতে পারবে। (সূরা আত-তাওবা ঃ ১২২)

২. ইলম অনুযায়ী আমল করা ঃ দাওয়াত দানকারী যে মহাসত্যের প্রতি মানুষকে আহ্বান করবেন সে আদর্শ অবশ্যই তাকে গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনের সকল কাজ কর্ম, লেন-দেন ইত্যাদির মাধ্যমে সে আদর্শের বাস্তব নমুনা পেশ করতে হবে। নিজের জীবনের আমল না করে অপরকে সে বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার কোন নৈতিক অধিকার থাকতে পারে না এবং তা ফলপ্রসূ হতে পারে না। আল্লাহর বাণী ঃ

أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ

"তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ কর আর নিজেরা তা ভুলে থাক। অথচ তোমরা কিতাবও পাঠ কর। " (সূরা আল- বাকারা ঃ ৪৪)

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ

"তোমরা এমন কথা কেন বল? (অপরকে উপদেশ দাও) যা তোমরা করো না। এটা আল্লাহর নিকট বড়ই ঘৃণার বিষয় যে, তোমরা যা বলবে তা করবে না।" (সূরা আস-সফ ঃ ২)

৩. সাবের বা ধৈর্যশীল হওয়া ঃ দীনি দাওয়াতের জন্য সবরের প্রয়োজন। যুগে যুগে যারাই এ কাজ করেছে তাদের উপরই অত্যাচার ও নির্যাতন নেমে এসেছে। সবর ছাড়া এ পথে টিকে থাকা যায় না। আল্লাহর বাণী ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবর কর এবং সবরের প্রতিযোগিতা কর।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ২০০)

৪. স্পষ্টভাষী হওয়া ঃ দাওয়াত দাতাকে স্পষ্টভাষী হতে হবে। যাতে তার বক্তব্য সকলে অনায়াসে বুঝতে পারে। ভাষার মার-প্যাঁচ পরিহার করতে হবে। সাবলীল ভাষায় বক্তব্য পেশ করতে হবে। ভালভাবে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে।

৫. শ্রোতার বুদ্ধিমত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখা ঃ দাওয়াত দাতার বক্তব্য উপস্থাপনের সময় শ্রোতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা করে বক্তব্য পেশ করতে হবে। সাধারণ লোকদের সমাবেশে সুধী সমাবেশের যোগ্য বক্তৃতা যেমন উলুবনে মুক্তা ছড়ানো, তেমনি সুধী সমাবেশে জ্ঞান গাম্ভীর্যহীন হালকা বক্তব্য দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ করবে। সুতরাং স্থান, কাল পাত্র ভেদে প্রচারকার্য পরিচালনা করতে হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

وَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهٖ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ الْجَوَاهِرَ وَ اللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

"অপাত্রে জ্ঞান দান করা শুকরের গলায় মনিহার পরানোর শামিল।" (ইবনে মাজাহ)

৬. বল প্রয়োগে বিরত থাকা ঃ কোন অবস্থাতেই শ্রোতাদের ওপর বল প্রয়োগ করে দীনি দাওয়াত কবুল করার চাপ সৃষ্টি ইসলাম সম্মত কোন কাজ নয়। বল প্রয়োগ বলতে শুধু দৈহিক শক্তিই বুঝায় না। বরং প্রতিকুল

পরিবেশ সৃষ্টি করে অথবা কৌশলে দূরাবস্থায় ফেলে ধর্মান্তর করাও বল প্রয়োগের পর্যায়ে পড়ে। ইহা কোন স্থায়ী ফল বয়ে আনে না। ইসলাম মানুষের মনকে জয় করেই মনের গহীনে স্থান করে নিতে চায় যেখান থেকে কোন দিন ইসলাম দূরীভূত হবে না। এ প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী ঃ

لَا اِكْرَاهَ فِيْ الدِّيْنِ

"দীনের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি নেই।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬)

৭. পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে দাওয়াত দেয়া ঃ দাওয়াতদাতাকে অবশ্যই পরিবেশ-পরিস্থিতি ও শ্রোতার মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে দাওয়াত দিতে হবে। শ্রোতার অমনোযোগী অবস্থায়, অসময়ে, দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ করে ও বিরূপ পরিবেশে দাওয়াত পেশ করলে তা ফলপ্রসূ হয় না।

৮. মূল বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া ঃ দাওয়াতের মূল টার্গেট হবে এক আল্লাহর প্রতি আহ্বান। পুরোপুরি যুক্তি সংগত ও বাস্তব ভিত্তিক কথা বলা। (সূরা ফাতিরের বিষয় বস্তু তাফহীম)

এ লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনে সমসাময়িক অবস্থা তুলে ধরা যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনায় আনতে হবে এবং তা পুনরাবৃত্তি কতে হবে। রাসূল (স) তাঁর ভাষণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তিনবার উচ্চারণ করতেন।

দাওয়াত দানের পন্থা ঃ এক ব্যক্তি যেমন একজনকেও দাওয়াত দিতে পারেন, তেমনি একাধিক ব্যক্তিকেও দাওয়াত দিতে পারেন। সমষ্টিগতভাবে একাধিক ব্যক্তি এক ব্যক্তির কাছেও দাওয়াত পেশ করতে পারেন, তেমনিভাবে একাধিক ব্যক্তির কাছেও দাওয়াত পেশ করতে পারেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। যথা

১. গণমাধ্যম ব্যবহার ঃ বর্তমান বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগে দীনের প্রচার ও প্রসারের জন্যে বেতার, টেলিভিশন, ভিডিও, অডিও, সিডি ও সিনেমাসহ প্রভৃতি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গণপ্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে ব্যাপকভাবে কাজ করা যায়। এ পদ্ধতি জনগণের হৃদয়গ্রাহী ও খুবই আকর্ষণীয় হয়।

ক. ওয়াজ-মাহফিল ও সভা সমিতির মাধ্যমে ঃ মসজিদ-মাদরাসাসহ বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ-মাহফিল ও সভা সমিতির মাধ্যমে ব্যাপক দাওয়াতে দীনের কাজ করা যায়।

খ. সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে ঃ ইসলামের বিভিন্ন বিষয় ও বিভাগের উপর সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সমকালীন মুসলিম বিশ্ব পরিস্থিতি তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করলে উচ্চ শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণী লোকেদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা যেতে পারে।

গ. পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশের মাধ্যমে ঃ পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশের মাধ্যমে ইসলামের সুমহান আদর্শ জনগনের সম্মুখে উপস্থাপন করা। এতে সহজে দীনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় এবং দ্রুত ইসলামের প্রসার ঘটে।

ঘ. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ অপসংস্কৃতি রোধকল্পে সুস্থ ও ইসলামী সংস্কৃতি চালু করার লক্ষ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাপক ভাবে দীনের কাজ করা যায়। এতে অনায়াসে মানুষ দীনের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

২. ইসলামী বই-পুস্তক রচনা ও প্রচারের মাধ্যমে ঃ কুরআনের তাফসীর, হাদীসের অনুবাদ, ইসলামের বিভিন্ন বিষয়াদির উপর সহজ ও সরল ভাষায় ইসলামী বই-পুস্তক রচনা ও প্রচারের মাধ্যমে দাওয়াতে দীনের ব্যাপক কাজ করা যায়। ইহা উত্তম ও স্থায়ী পদ্ধতি। এ লক্ষ্যে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

ক. ব্যক্তিগতভাবে বই সঙ্গে রাখা ও অপরকে পড়ানো।

খ. ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা।

গ. বই বিক্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলা।

ঘ. ব্যক্তিগতভাবে বই বিক্রয় করা।

৩. শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ঃ শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা ছাড়া জাতির কোন উন্নতি নাই। যে জাতি নৈতিক দিক দিয়ে যত উন্নত তারাই

প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী। মুসলমানরা একদিন সারা দুনিয়ায় নেতৃত্ব করেছে নৈতিকতার বলেই। তাই জাতিকে নৈতিক বলে বলিয়ান করতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শিক পরিবর্তন ছাড়া কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য দেশের সকল স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও ইউনিভার্সিটিসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। তবেই কেবল সৎ, যোগ্য ও আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ

অনুবাদ

আর যদি তোমরা প্রতিশোধ নাও, তাহলে ঠিক ততটুকু নাও যতটুকু তোমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা সবর করো তাহলে নিশ্চিতভাবেই এটা সবরকারীদের পক্ষে উত্তম।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ আয়াতে প্রথমতঃ আল্লাহর পথে দাওয়াত দানকারীদের আইনগত অধিকার দেয়া হয়েছে যে, যারা নির্যাতন চালায়, তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা আপনার জন্যে বৈধ, কিন্তু এই শর্তে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্যাতনের সীমা অতিক্রম করা যাবে না। যতটুকু জুলুম প্রতিপক্ষের তরফ থেকে করা হয়, প্রতিশোধ ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে; বেশী হতে পারে না। আয়াতের শেষে পরামর্শ দেয়া হয়েছে, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার রয়েছে, কিন্তু সবর করা উত্তম।

শানে নুযূল

সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদগণের মতে এ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ। ওহুদ যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবীর শাহাদাত বরণ এবং হযরত হামযা (রা)-কে হত্যার পর তাঁর লাশের নাক কান কর্তনের ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। সহীহ্ বোখারীর রেওয়ায়েত তদ্রুপই। দার-কুতনী হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, ওহুদ যুদ্ধে-ময়দান থেকে মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার পর সত্তর জন সাহাবীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো। তাঁদের মধ্যে রাসূল (স) এর শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য হযরত হামযা (রা) এর মৃতদেহও ছিল। এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে রাসূল (স) দারুণভাবে মর্মাহত

হলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি হামযার পরিবর্তে মুশরিকদের সত্তর জনের মৃতদেহ বিকৃত করব। এ ঘটনা সম্পর্কে وَإِنْ عَاقَبْتُمْ শীর্ষক তিনটি আয়াত নাযিল হয়েছে। (তাফসীরে কুরতুবী)

কোন কোন রেওয়াতে রয়েছে যে, কাফেররা অন্যান্য সাহাবীদের মৃতদেহও বিকৃত করেছিল। (তিরমিযি, আহমদ ইবনে খযায়মা, ইবনে-হাব্বান)

এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স) সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই দুঃখের আতিশয্যে বিকৃতদেহ সাহাবীদের পরিবর্তে সত্তর জন মুশরিকের মৃতদেহ বিকৃত করার সংকল্প করেছিলেন। এটা আল্লাহর কাছে সে সমতা ও সুবিচারের অনুকূল ছিল না, যা তাঁর মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার আপনার রয়েছে বটে, কিন্তু সে পরিমাণই, যে পরিমাণ জুলুম হয়েছে। সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখে কয়েক জনের প্রতিশোধ সত্তর জনের উপর শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে ঠিক নয়। দ্বিতীয় ঃ রাসূল্লাহ (স)-কে ন্যায়ানুগ আচরণের উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি যদিও রয়েছে, কিন্তু তাও ছেড়ে দিন এবং অপরাধীদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। এটা অধিক শ্রেয়।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ এখন আমরা সবরই করব। একজনের উপরও প্রতিশোধ নেব না। এরপর তিনি কসমের কাফফরা আদায় করে দেন। (মাযহারী)

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ

অনুবাদ

হে মুহাম্মদ সবর অবলম্বন করো। আর তোমার এ সবর আল্লাহরই সুযোগ দানের ফলমাত্র। এদের কার্যকলাপে দুঃখ করো না এবং এদের চক্রান্তের কারণে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

যারা আল্লাহকে ভয় করে সব ধরনের খারাপ পথ থেকে দূরে থাকে এবং সর্বদা সৎকর্মনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে অন্যেরা তাদের সাথে যতই খারাপ আচরণ করুক না কেন তারা দুষ্কৃতির মাধ্যমে তার জবাব দেয় না বরং জবাব দেয় সুকৃতির মাধ্যমে এবং সবরের পথ অবলম্বন করে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সবর করার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছে ঃ

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلاً

"অতএব (হে মুহাম্মদ) সবর করো, সবরে জামীল।" (সূরা মায়ারিজ ঃ ৫)

সবর অর্থ ঃ "সবর" আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ ধৈর্য। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, অন্যায়-অত্যাচার ইত্যাদি বালা-মুসিবতে কোনরূপ বিচলিত না হয়ে অবিচল চিত্তে সব কিছু আল্লাহর উপর ন্যস্ত করে ধৈর্যধারণ করাকে "সবর" বলে। যিনি ধৈর্যধারণ করেন তাকে সাবের বা ধৈর্যশীল বলে।

ধৈর্যশীল বলতে বুঝানো হয়েছে সে ব্যক্তিকে, যে লোক নিজের নফসকে কাবু করে রাখতে পারে এবং ভাল মন্দ উভয় প্রকার অবস্থায়ই বান্দার উপযোগী আচরণ গ্রহণে অবিচল থাকে। সুখ-সাচ্ছন্দের সময় নিজের সত্তাকে ভুলে গিয়ে আল্লাহদ্রোহিতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠবে না এবং দুঃখ দৈন্যের সময়ও হতাশ হয়ে হীন আচরণ শুরু করবে না। এরূপ অবস্থা তার কখনও হয় না। (তাফহীমুল কুরআন)

ইমাম মালেক (র) বলেন ঃ ধৈর্যশীল ঐ ব্যক্তি যে দুনিয়াতে বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্টে সবর করে। কেউ কেউ বলেন যারা পাপ কাজ থেকে সংযম অবলম্বন করে। পাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কষ্ট সহ্যকারীকে ধৈর্যশীল বলে। (কুরতুবী)

সুখ-দুঃখ মানুষের জীবনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষ কোন সময় রোগ, শোক, দারিদ্র বা অন্য কোন বিপদাপদের সম্মুখীন হতে পারে। এমতাবস্থায়, তাকে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না, বরং সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর

উপর ভরসা রেখে ধৈর্যধারণপূর্বক প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করতে হবে এবং বলতে হবে ঃ

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

"নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।" (সূরা বাকারা ঃ ১৫৬)

اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْاِيْمَان

"ধৈর্য ইমানের অর্ধাংশ।" (আবু নাঈম)

اَلصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ

"ধৈর্যের বিনিময় হলো জান্নাত।" (বায়হাকী)

আল্লাহ তাআলা পরকালে সবরের অধিক পুরস্কার দান করবেন ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"ধৈর্যধারণকারীদেরকে অগণিত পুরস্কার দেয়া হবে।" (সূরা যুমার ঃ ১০)

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ

"আল্লাহ তাআলা ধৈর্যধারণকারীদের সাথে আছেন।" (সূরা বাকারা ঃ ১৫৩)

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ

অনুবাদ

আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লাহ তাআলা তাক্বওয়া অবলম্বনকারীদের সাথে থাকেন। আর তাক্বওয়া সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেছেন ঃ তাক্বওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা। তাঁর নাফরমানী না করা, আল্লাহকে স্মরণ করা, তাকে ভুলে না যাওয়া এবং আল্লাহর শোকরিয়া

আদায় করা ও তাঁর কুফরী না করা। আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের ভালবাসেন। এ সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ

অতএব তুমি সবরের পথ ধরো। শুভ পরিণতি তো মুত্তাকীদের জন্যই নির্দিষ্ট। (সূরা আল হুদ ঃ ১১৫)

وَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৯৪)

শিক্ষা

১. আল্লাহর পথে আহ্বান করতে হবে হিকমতের সাথে।
২. আহ্বানের ভাষা হবে চিত্তাকর্ষক।
৩. দাওয়াত পেশ করতে হবে যুক্তির মাধ্যমে।
৪. দাওয়াত দাতাকে ধৈর্যশীল হতে হবে।
৫. দাওয়াত দাতাকে প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতা পরিহার করতে হবে।

৬

মু'মিনদের গুণাবলী

২৩. সূরা আল-মু'মিনুন

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত-১১৮, রুকু-৬

আলোচ্য আয়াত ঃ ১-১১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(١) قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ (٢) الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ (٣) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ (٤) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ (٥) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ (٦) إِلاَّ عَلٰى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ (٧) فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذَالِكَ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ (٨) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ (٩) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ (١٠) أُوْلٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ (١١) الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (১) অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ। (২) যারা নিজেদের নামাযে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে। (৩) যারা নিরর্থক বা বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে। (৪) যারা যাকাত দানে সক্রিয়। (৫) যারা নিজেদের যৌন অংগকে সংযত রাখে। (৬) নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত। উহাতে তাদের কোন দোষ হবে না। (৭) এবং কেহ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী। (৮) এবং যারা নিজেদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে। (৯) এবং যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান থাকে। (১০) এরাই হচ্ছে সেই উত্তরাধিকারী। (১১) তারা ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকবে।

শব্দার্থ ঃ قَدْ اَفْلَحَ ঃ অবশ্যই সফলকাম হয়েছে। اَلْمُؤْمِنُوْنَ ঃ মুমিনগণ। اَلَّذِيْنَ ঃ যারা। هُمْ ঃ তারা। فِي صَلاَتِهِمْ ঃ তাদের নামাযে। خَاشِعُوْنَ ঃ বিনয়ী। اَلَّذِيْنَ ঃ যারা। هُمْ ঃ তারা। عَنْ হতে। اللَّغْوِ ঃ বেহুদা কাজ। مُعْرِضُوْنَ ঃ দূরে থাকে اَلَّذِيْنَ ঃ যারা। لِلزَّكَاةِ ঃ যাকাতদানে। فَاعِلُوْنَ ঃ কর্মতৎপর। هُمْ ঃ তারা। لِفُرُوْجِهِمْ ঃ তাদের যৌন অংগ। حَافِظُوْنَ হেফাযত করে। اِلاَّ ঃ ব্যতীত। عَلٰى أَزْوَاجِهِمْ ঃ তাদের স্ত্রীদের। أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ঃ অথবা অধিকারভুক্ত দাসিগণ। فَاِنَّهُمْ ঃ নিশ্চয় তাদের। غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ঃ তাদের কোন দোষ হবে না। فَمَنْ ঃ যে ব্যক্তি। اِبْتَغٰى কামনা করে। وَرَاءَ ذٰلِكَ ঃ এদের ব্যতীত। أُوْلٰئِكَ ঃ এ সকল লোক। هُمُ الْعَادُوْنَ ঃ তারাই সীমালঙ্ঘনকারী হবে। اَلَّذِيْنَ যারা। هُمْ ঃ তারা। لِأَمَانَاتِهِمْ ঃ তাদের আমানত। وَعَهْدِهِمْ ঃ তাদের ওয়াদা। رَاعُوْنَ ঃ রক্ষণা-

বেক্ষণ করে। الَّذِيْنَ ঃ যারা। هُمْ ঃ তারা। عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ ঃ তাদের নামাযে। يُحَافِظُوْنَ ঃ হেফাযত করে। الْوَارِثُوْنَ ঃ সেই উত্তরাধিকারী। الَّذِيْنَ ঃ যারা। يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ঃ উত্তরধিকার হিসাবে ফেরদাউস পাবে। هُمْ ঃ তারা। فِيْهَا ঃ সেখানে। خَالِدُوْنَ ঃ চিরদিন থাকবে।

সূরার নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতে قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ এর "আল মু'মিনুন" শব্দ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ সূরার শুরুতেই মু'মিনদের সফলতা লাভের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময় কাল

মহা নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময় এ সূরা নাযিল হয়েছিল। সে সময় মহানবী (স) ও কাফেরদের মধ্যে ভীষণ সংঘাত চলছে। কিন্তু তখনো কাফেরদের নির্যাতন নিপীড়ন চরমে পৌঁছে যায়নি। তখন হযরত উমর (রা) ঈমান এনেছিলেন। আর তারই সামনে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। তিনি নিজে নবী কারীম (স) এর ওপর ওহী নাযিল হওয়ার বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখতে পেয়েছিলেন। রাসূল (স) এর উপরে যখন ওহী অবতীর্ণ হত তখন তাঁর মুখের কাছে মৌমাছির গুণ গুণ শব্দের মত শব্দ শোনা যেত। একদা তাঁর উপর এ অবস্থাই ঘটে। নবী কারীম (স) যখন বিশেষ অবস্থা থেকে অবসর নিলেন। তখন রাসূল (স) কেবলামুখী হয়ে বসে গেলেন এবং নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করতে লাগলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلاَ تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلاَ تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلاَ تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلاَ تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضَ عَنَّا وَارْضِنَا

হে আল্লাহ আমাদেকে বেশী দাও কম দিও না। আমাদের সম্মান বৃদ্ধি কর। লাঞ্ছিত করো না। আমাদেরকে দান কর বঞ্চিত করো না। আমাদেরকে

অন্যের উপর অগ্রাধিকার দাও অন্যদেরকে আমাদের উপর অগ্রাধিকার দিয়ো না এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক এবং আমাদেরকে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট কর। (তিরমিযী)

অতপর তিনি বললেন, এই মাত্র আমার উপর এমন দশটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যার মানদন্ডে কেহ উত্তীর্ণ হলে সে নিঃসন্দেহে জান্নাতে যাবে। অতঃপর রাসূল (স) এ সূরার قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ হতে শুরু করে ১০টি আয়াত পড়ে শুনান। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও হাকিম)

আলোচ্য বিষয় ঃ গোটা সূরার আলোচ্য বিষয়ই হচ্ছে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত, যে ব্যক্তি রাসূলের দাওয়াত কবুল করে তার আনুগত্য করবে এবং তাঁর আদর্শের অনুসরণ করে চলবে তার মধ্যেই মুমিনদের এ গুণ ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবে। তাহলেই মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভে ধন্য হবে।

আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ

অনুবাদ

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

মুমিন হচ্ছে তারা যারা মুহাম্মদ (স) এর দাওয়াত কবুল করেছেন এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণ করেছেন। আলোচ্য আয়াতে মু'মিনদের নিশ্চিত সাফল্য লাভের কথা বলা হয়েছে। এ সাফল্য হচ্ছে জান্নাতের, পরকালে তা পাওয়া যাবে। তবে দুনিয়ার জীবনেও মুমিনদেরকে আল্লাহ তাআলা সফলতা দিয়ে থাকেন। আযান ও একামতে দৈনিক পাঁচবার প্রত্যেক মুসলমানকে সাফল্যের দিকে আহ্বান করা হয়। اَفْلَحَ মানে সফলতা অর্থাৎ প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হওয়া। কোন মানুষ এর চেয়ে বেশি কিছু কামনা করতে পারে না। কোন মানুষ যদি সারা দুনিয়ার বাদশাহ হয় তবুও তার সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া ও প্রত্যেক কষ্ট থেকে দুরে থাকা

সম্ভব নয়। তাছাড়া অন্তরে কোন কিছু জাগ্রত হওয়া মাত্রই তা দুনিয়াতে পূর্ণ হয় না। এটা পরকালে জান্নাতেই সম্ভব। সেখানে মন যা চাবে, তাই পাওয়া যাবে। وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ অর্থাৎ তারা যা চাবে, তাই পাবে। সামান্যতম ব্যাথ্যা ও কষ্ট থাকবে না। প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ কালে বলবে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ وَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

اَلَّذِيْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং স্বীয় কৃপায় আমাদেরকে এমন এক স্থানে দাখিল করেছেন যার প্রত্যেক বস্তু সুপ্রতিষ্ঠিত ও চিরন্তন। কারা সফলতা লাভ করেছেন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى " যে নিজেকে পাপ কর্ম থেকে পবিত্র রেখেছে সে সাফল্য লাভ করেছে। (সূরা আ'লা ঃ ১৪)

তাই আমাদেরকে পরকালের প্রাধান্য দিয়ে কাজ করা প্রয়োজন।

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى

তোমরা দুনিয়াকেই পরকালের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাক; অথচ পরকালই উত্তম। (সূরা আ'লা ঃ ১৬)

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ

অনুবাদ

যারা নিজেদের নামাযে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রথম গুণ ঃ এ সূরায় মুমিনদের মোট সাতটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে প্রথম গুণের কথা বলা হয়েছে। আর তা হচ্ছে মুমিনগণ বিনয়ী ও নম্র হবে। এখানে বিনয়ী ও নম্র বুঝার জন্য خشوع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। খুশু' শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে কারো সম্মুখে বিনয়াবনত

হওয়া। বিনীত হওয়া নিজের কাতরতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা। এ অবস্থার সম্পর্ক দিলের সঙ্গে যেমন তেমনি দেহের বাহ্যিক অবস্থার সহিতও। অন্তরের খুশু হয় তখন যখন কারো ভীতি মহানত্ব ও দাপটে অন্তর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। আর দেহের খুশু এইরূপে অবনমিত হয়ে যায়; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ে, চক্ষু অবনমিত হয়ে আসে, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে যায় এবং ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ায় সেই সব লক্ষণই প্রকট হয়ে পড়ে যা এইরূপ অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবেই সৃষ্টি হয়ে যায়। তখন ব্যক্তি কোন মহাশক্তির প্রচন্ড দাপটের অধিকারী কোন সত্তার সম্মুখে উপস্থিত হয়। আর নামাযে খুশু বলতে বুঝায় মন ও দেহে এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হওয়াকে। নামাযের আসল প্রাণশক্তি ও অভ্যন্তরীণ ভাবধারা ইহাই। হাদীসে বলা হয়েছে, একবার নবী কারীম (স) দেখলেন এক ব্যক্তি নামায পড়ছে, আর সেই সঙ্গে মুখের দাড়ি নিয়ে খেলা করছে। তখন নবী কারীম (স) বললেন ঃ

لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ

এ ব্যক্তির দিলে যদি খুশু থাকত তাহলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর খুশু পরিলক্ষিত হত।

যদিও খুশুর আসল সম্পর্ক ব্যক্তির অন্তরের সাথে, আর দিলের খুশু আপনা হতেই দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে উপরের হাদীস থেকে তাই জানা যায়।

তাই মুমিন ব্যক্তিগণ শরীয়ত নির্ধারিত নামাযের সকল নিয়ম নীতি অনুসরণ করে দেহ মনকে এমনভাবে নিয়োজিত রাখবে যাতে মনে করবে

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ

তুমি এভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পাচ্ছে। আর যদি সম্ভব না হয় তবে অবশ্যই মনে করবে যে আল্লাহ তাআলা তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।

আর এ ধরনের একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য নামাযে যে কেরাত ও দুআ দুরূদ পাঠ করা হয় তার অর্থের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন অপ্রাসংগিক চিন্তা ভাবনা মনে জাগ্রত হলে সাথে সাথেই তার থেকে মনকে ফিরিয়ে নামাযের দিকে নিয়ে আসতে হবে। মুমিনের প্রথম গুণই হচ্ছে

নামাযে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করা। তাই নামায আদায় করতে হবে খুশু-খুজুর সাথে।

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ

অনুবাদ

যারা নিরর্থক বা বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

মুমিনদের দ্বিতীয় গুণ ঃ অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা। لَغْوٌ বলা হয় এমন প্রত্যেকটি কাজ বা কথাকে, যা অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন এবং নিষ্ফল। সেসব কাজ বা কথার কোন প্রয়োজন নেই। যাতে কোন কল্যাণ লাভ হয় না। مُعْرِضُوْنَ শব্দের অর্থ নির্লিপ্ত, দূরে সরে থাকে, বাজে কাজ বা বেহুদা জিনিসের দিকে লক্ষ্য দেয় না। কোথাও এমন কাজ হলে মুমিনগণ তা করে না এবং অংশ নেয় না। কোথাও বেহুদা কাজের মুখোমুখী হলে আত্মরক্ষা করে চলে। কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا

তারা যদি এমন কোন স্থানে যেয়ে পড়ে যেখানে এ বেহুদা অর্থহীন বাজে কাজ বা কথা হচ্ছে দেখতে পায়, তবে সেখান হতে তারা আত্ম মর্যাদা রক্ষা করে চলে যায়। (সূরা ফুরকান ঃ ৭২)

মুমিন ব্যক্তি হয় সুস্থ স্বভাবের লোক, পবিত্র চরিত্র সম্পন্ন রুচির ধারক। তাই রাসূল (স) বলেছেন ঃ

مِنْ حُسْنِ اِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يُعْنِيْهِ

মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্য মন্ডিত হতে পারে। বেহুদা কাজ-কর্মের প্রতি মুমিনদের মন কোনভাবে আকর্ষণ বোধ করে না। আল্লাহ তাদেরকে পরকালে সে জান্নাত দান করবেন সেখানেও তাদেরকে এর থেকে পবিত্রতা দান করবেন। কুরআনের ভাষায়

لاَ تَسْمَعُ فِيْهَا لاَغِيَةً "সেখানে কোন অর্থহীন বেহুদা কথা-বার্তা তারা শুনবে না। (সূরা আল-গাশিয়াহ ঃ ১১)

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ

অনুবাদ

"যারা যাকাত দানে সক্রিয়"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

তৃতীয় গুণ ঃ এখানে মুমিনদের গুণ-বৈশিষ্ট্য হিসাবে يُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ তারা যাকাত দেয়, একথা না বলে لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ বলার কারণ অধিক গুরুত্ববহ। زكاة শব্দের দু'টি অর্থ ঃ ১। পবিত্রতা। ২। ক্রমবিকাশ। يُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ তারা পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিজেদের মাল-সম্পদের একটি অংশ দেয় বা আদায় করে। এতে মালের যাকাত আদায় করার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। যদি বলা হয় لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ তখন অর্থ হবে, তারা পবিত্রতা অর্জনের কাজ করছে। এর দ্বারা তখন শুধুমাত্র যাকাত আদায় করারই অর্থ বুঝাবে না, বরং ব্যাপকভাবে মনের পবিত্রতা, চরিত্রের পবিত্রতা জীবনের পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা, ধন-সম্পদের পবিত্রতা সর্বমুখী পবিত্রতা বিধানের কথা বুঝাবে। তাই এখানে বুঝানো হয়েছে। তারা নিজেরা পবিত্রতা বিধানের কাজ করে, অন্যদেরকেও পবিত্র করার কাজ আঞ্জাম দেয়। নিজের মধ্যে মানবতার মূল ধারাকে বিকাশ দান করে, আর বাইরের জীবনেও উহার উন্নতি বিধানের জন্য সচেষ্ট থাকে। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াতে এ ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

কল্যাণ ও সফলতা লাভ করল সে, যে পবিত্রতা অবলম্বন করল এবং নিজের রব এর নাম স্মরণ করে নামায পড়ল। (সূরা আলা ঃ ১৫)

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

"সাফল্যমন্ডিত হল সে, যে নফসের পবিত্রতা সাধন করল। আর ব্যর্থ হল সে, যে নিজেকে কলুষিত করল। (সূরা আশ শামস ঃ ৯-১০)

এখানে নফসকে শিরক ও কুফুরির ময়লা আবর্জনা থেকে পবিত্র করার অর্থ হয়। মুমিনদের আর একটি বিশেষণ এই যে, তারা তাদের মালের যাকাত আদায় করে থাকে।

وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ

ফসল কাটার দিনেই তার যাকাত আদায় কর। (সূরা আল-আনফাল ঃ ১৪১)

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ، إِلاَّ عَلٰى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ

অনুবাদ

যারা নিজেদের যৌন অংগকে সংযত রাখে নিজেদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত উহাতে তাদের কোন দোষ হবে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

চতুর্থ গুণ ঃ মু'মিন ব্যক্তির অন্যতম গুণ হচ্ছে যে, নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহকে ঢেকে রাখে, যারা নগ্নভাবে চলে না এবং নিজেদের লজ্জাস্থানকে অপর লোকের সামনে প্রকাশ করে না। তাছাড়া তারা নিজেদের পবিত্রতা ও সতীত্বকে রক্ষা করে। যৌন উচ্ছৃংখলতার প্রশ্রয় দেয় না। শরীয়তের বিধান মোতাবেক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারো সাথে কোন অবৈধ পন্থায় কামনা বাসনা পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হয় না। যারা নিজ স্ত্রী ও শরীয়ত সম্মত দাসীদের সাথে কামনা-বাসনা পূর্ণ করবে তারা তিরস্কৃত হবে না।

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ

অনুবাদ

কেহ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

বিধি সম্মত উপায়ে নফসের খাহেস পূর্ণ করা কোন দোষের কাজ নয়। গুনাহের কাজ হবে তখন যদি কোন যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য এই প্রচলিত ও বৈধ উপায় লঙ্ঘন করে।

১. এ দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় যেনা করা হারাম।
২. যাদের সাথে বিবাহ করা নিষেধ করা হয়েছে তাদেরকে বিবাহ করা হারাম।
৩. স্ত্রীর সাথে হায়েয নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করা হারাম।
৪. কোন পুরুষ বা বালকের সাথে অথবা জীব জন্তুর সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা হারাম।
৫. হস্তমৈথুন করা হারাম

বৈধ আকার ছাড়া যে পন্থায় কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য অন্য যে কোন পন্থা গ্রহণ করা হোক না কেন তা সবই হারাম।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ

অনুবাদ

এবং যারা নিজেদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

পঞ্চম গুণ ঃ আমানত রক্ষা করা। امانات (আমানত) একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। একজন মুমিনকে মনে রাখতে হবে যে সে একজন বড় আমানতদার। প্রথমেই সে হলো একজন তাওহীদের আমানতদার। তাই তাকে অবশ্যই সকল বিষয়ে এ বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করে চলতে হবে। ঈমানদারের কাছে যে কোন লোকের বা সমাজ ও রাষ্ট্রের ধনমাল, বিষয়-

সম্পত্তি, কাজ কর্ম, কথা বার্তার জিম্মাদার নির্বিঘ্নে অর্পন করা যেতে পারে। যে কোন মানুষ যে কোন মূল্যের মহামুল্যবান সম্পদ তার কাছে গচ্ছিত রাখতে পারবে। আর তিনিও সে সম্পদকে জীবনের যে কোন মূল্যের বিনিময়ে রক্ষা করে যাবেন। কখনো তার খিয়ানত করবে না। এ শ্রেণীর মানুষেরাই হলেন প্রকৃত মুমিন ও আমানদার।

আমানতের তাৎপর্য অতীব ব্যাপক। পৃথিবীতে প্রতিটি নর-নারীর ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনের এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোন কোন অল্প বিস্তার দায়িত্ব রয়েছে। এ দায়িত্ব হলো আমানতের অন্তর্ভূক্ত। আর এ সব আমানত যথাযথ ভাবে রক্ষ করা এবং সঠিক মালিককে পৌঁছে দেয়া ইসলামী নৈতিকতার দাবী।

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا

আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা যেন আমানত তাদের হকদারের নিকট ঠিক ঠিকভাবে পৌঁছে দাও। (সূরা আন-নিসা ঃ ৫৮)

ষষ্ঠ গুণ ঃ অঙ্গীকার পূর্ণকরা ঃ অঙ্গীকার বলতে প্রথমত দ্বিপক্ষিয় চুক্তি বোঝায়, যা কোন ব্যাপারে উভয় পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এরূপ চুক্তি পূর্ণ করা ফরয এবং এর খেলাফ করা বিশ্বাস ঘাতকতা, প্রতারণা তথা হারাম। আর দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয়, এক তরফা ভাবে একজন অন্য জনকে কিছু দেয়ার অথবা অন্য জনের কোন কাজ করে দেওয়ার ওয়াদা করা। এরূপ ওয়াদা পূর্ণ করাও শরীয়তের আইনে জরুরী ও ওয়াজিব। ওয়াদা এক প্রকার ঋণ। ঋণ আদায় করা যেমন ওয়াজিব, ওয়াদা পূর্ণ করাও তেমনি ওয়াজিব। শরীয়ত সম্মত ওযর ব্যতীত এর খেলাফ করা গোনাহ। (মা'আরেফুল কুরআন)

لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ

যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার যেন ঈমান নেই, আর যার মধ্যে ওয়াদা পূর্ণ করার গুণ নেই দীন নেই। (বায়হাকী)

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ

অনুবাদ

এবং যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান থাকে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

সপ্তম গুণ ঃ এখানে নামাযের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। নামাযে যত্নবান হওয়ার অর্থ নামাযের পাবন্দী করা এবং প্রত্যেক নামায মোস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করা। (রুহুল মাআনী)

حَافِظُوْا عَلٰى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

তোমাদের নামাযগুলো সংরক্ষণ করো, বিশেষ করে এমন নামায যাতে নামাযের সমস্ত গুণের সমন্বয় ঘটেছে। আল্লাহর সামনে এমনভাবে দাঁড়াও যেমন অনুগত সেবকরা দাঁড়ায়। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩৮)

আল্লাহ তাআলার নিকট সকল ইবাদতের মধ্যে সালাতই হলো সর্বোত্তম ইবাদত। মহানবী (স) বলেন ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اَفْضَلَ اَعْمَالِكُمُ الصَّلٰوةُ

"জেনে রাখ নামাযই তোমাদের সর্বোত্তম ইবাদত।"

অতএব, যেহেতু নামায সর্বোত্তম ইবাদত। তাই নামাযে সকল হুকুম আহকামের প্রতি লক্ষ্য রেখেই নামায আদায় করা অতিব জরুরী।

এই সাতটি গুণ শুরু করা হয়েছে নামায দ্বারা এবং এর শেষও করা হয়েছে নামায দ্বারা। এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযের হুকুম আহকাম যথাযথ ভাবে আদায় করলে অবশিষ্টগুণ গুলো আপনা আপনি নামাযীর মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে।

যাদের চরিত্রে উল্লেখিত গুনাবলীর সমাবেশ ঘটবে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী করবেন। কুরআনের ভাষায় ঃ

أُوْلٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

অনুবাদ

তারা ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আট বেহেশতের মধ্যে জান্নাতুল ফিরদাউস সর্বোত্তম। তাঁর অধিবাসীরেদ সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

ঈমানদার এবং নেককার বান্দাগণ জান্নাতুল ফিরদাউসে আল্লাহর অতিথি হবেন। (কাহাফ ঃ)

বেহেশতের অনন্ত সুখ ও ভোগ বিলাস, আরাম-আয়েশের প্রকৃতি স্বরূপ পার্থিব-ভোগ-বিলাস হতে যে কত বেশী ও উন্নত তা অকল্পনীয়। এ ব্যাপারে হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন পুরস্কার প্রস্তুত রয়েছে যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শোনেনি এবং কোন মানব হৃদয় কল্পনা করেনি। (বুখারী, মুসলিম)

শিক্ষা

১. নিজেদের নামাযে বিনয় ও নম্র হতে হবে।
২. অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকতে হবে।
৩. যাকাত দানে সক্রিয় হতে হবে।
৪. নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখতে হবে।
৫. নিজেদের আমানতের পূর্ণ হেফাযত করতে হবে।
৬. ওয়াদা রক্ষা করে চলতে হবে।
৭. নিজেদের নামাযে যত্নবান হতে হবে।

৪

রহমানের বান্দাগণের পরিচয়

২৫. সূরা আল-ফুরকান

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত- ৭৭, রুকু-৬

আলোচ্য আয়াত ঃ ৬৩-৭৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি ।

(٦٣) وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَىٰ الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَماً (٦٤) وَالَّذِيْنَ يَبِيتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً (٦٥) وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً (٦٦) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً (٦٧) وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَاماً (٦٨) وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلَهاً آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَاماً (٦٩) يُضَاعَفْ لَهُ

الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانـاً (٧٠) إلاَّ مَـنْ تَـابَ وَآمَـنَ وَعَمِـلَ عَمَـلاً صَـالِحاً فَأُوْلَئِـكَ يُبَـدِّلُ اللّٰهُ سَـيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْراً رَّحِيْماً (٧١) وَمَـن تَـابَ وَعَمِـلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَاباً (٧٢) وَالَّذِيْنَ لاَ يَشْـهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَاماً (٧٣) وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّـرُوْا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَانـاً (٧٤) وَالَّـذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَـا هَـبْ لَنَـا مِـنْ أَزْوَاجِنَـا وَذُرِّيَّاتِنَـا قُـرَّةَ أَعْـيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَاماً.

অনুবাদ ঃ (৬৩) রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের সাথে কথা বলতে আসে তখন তারা বলে, সালাম। (৬৪) এবং তারা রাত অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান থেকে। (৬৫) এবং তারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচাও। উহার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ। (৬৬) তাহা তো অত্যন্ত খারাপ স্থান ও অবস্থানের জায়গা। (৬৭) যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।(৬৮) এবং তারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে, সে শাস্তি ভোগ করবে। (৬৯) কিয়ামতের দিন উহার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা লাঞ্ছনা সহকারে পড়ে

থাকবে। (৭০) তারা নহে, যারা তাওবা করে ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পূণ্যের দ্বারা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৭১) যে ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়। (৭২) এবং যারা মিথ্যার সাক্ষী হয় না। আর কোন অর্থহীন বিষয়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে হলে তারা শরীফ মানুষের মতই অতিক্রম করে। (৭৩) এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে তার প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না। (৭৪) এবং যারা প্রার্থনা করে "হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি দান কর যারা হবে আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদেরকে মুত্তাকী লোকদের জন্য ইমাম বানাও।

শব্দার্থ ঃ وَ ঃ আর। عِبَادُ ঃ বান্দারা। الرَّحْمٰنِ ঃ দয়াময়ের। الَّذِيْنَ ঃ (তারাই) যারা। يَمْشُوْنَ ঃ চলাফেরা করে। عَلٰى ঃ উপর। الْأَرْضِ ঃ জমীনের। هَوْنًا ঃ নম্রতা সহকারে। وَ ঃ আর। إِذَا ঃ যখন। خَاطَبَهُمُ ঃ তাদেরকে সম্বোধন করে। الْجَاهِلُوْنَ ঃ অজ্ঞলোকেরা। قَالُوْا ঃ তারা বলে, سَلَامًا ঃ (তোমাদেরকে) সালাম। وَ ঃ এবং। الَّذِيْنَ ঃ যারা। يَبِيْتُوْنَ ঃ তারা কাটায়। لِرَبِّهِمْ ঃ তাদের রবের উদ্দেশ্যে। سُجَّدًا ঃ সিজদায়। وَقِيَامًا ঃ দাড়ান অবস্থায়। وَ ঃ ও। الَّذِيْنَ ঃ যারা। يَقُوْلُوْنَ ঃ বলে। رَبَّنَا ঃ হে আমাদের রব। اصْرِفْ ঃ বিদূরিত কর। عَنَّا ঃ আমাদের হতে। عَذَابَ ঃ শাস্তি। جَهَنَّمَ ঃ জাহান্নামের। إِنَّ ঃ নিশ্চয়ই। عَذَابَهَا ঃ তার আযাব। كَانَ ঃ হল। غَرَامًا ঃ প্রাণন্তকর। إِنَّهَا ঃ তা নিশ্চয়ই। سَاءَتْ ঃ কত নিকৃষ্ট। مُسْتَقَرًّا ঃ বিশ্রাম স্থল। وَ ঃ ও। مُقَامًا ঃ বাসস্থান। وَ ঃ এবং। الَّذِيْنَ ঃ

তারা (এমন যে)। إِذَا ঃ যখন। أَنْفَقُوا ঃ খরচ করে। لَمْ يُسْرِفُوْا ঃ অপবায়
করে না। لَمْ ঃ না। يَقْتُرُوْا ঃ কার্পণ্য করে। وَ ঃ এবং। كَانَ ঃ থাকে। بَيْنَ ঃ
মাঝে। ذَلِكَ ঃ এই (দুয়ের)। قَوَاماً ঃ দণ্ডায়মান। وَ ঃ এবং। الَّذِيْنَ ঃ যারা।
لَا ঃ না। يَدْعُوْنَ ঃ ডাকে। مَعَ ঃ সাথে। اللهِ ঃ আল্লাহ। إِلَهاً ঃ ইলাহ।
أُخَرَ ঃ অন্যকে। وَ ঃ আর। لَا ঃ না। يَقْتُلُوْنَ ঃ হত্যা করে। النَّفْسَ ঃ কোন
প্রাণকে। الَّتِيْ ঃ যাকে। حَرَّمَ ঃ নিষিদ্ধ করেছেন। اللهُ ঃ আল্লাহ। إِلاَّ ঃ
তবে। بِالْحَقِّ ঃ যথার্থ কারণ (হলে ভিন্ন কথা)। وَ ঃ আর। لَا يَزْنُوْنَ ঃ
ব্যভিচার করে না। وَ ঃ আর। مَنْ ঃ যে। يَفْعَلْ ঃ করবে। ذَلِكَ ঃ এটা।
يَلْقَ ঃ অর্জন করবে। أَثَاماً ঃ গুনাহ। يُضَاعَفْ ঃ দ্বিগুণ হবে। لَهُ ঃ তার
জন্যে। الْعَذَابُ ঃ আযাব। يَوْمَ ঃ দিনে। الْقِيَامَةِ ঃ কিয়ামতের। وَ ঃ
এবং। يَخْلُدْ ঃ স্থায়ীভাবে। فِيْهِ ঃ তার মধ্যে। مُهَاناً ঃ হীন অবস্থায়। إِلاَّ
ঃ তবে। مَنْ ঃ যে। تَابَ ঃ তাওবা করবে। وَ ঃ ও। آمَنَ ঃ ঈমান আনবে।
وَ ঃ ও। عَمِلَ ঃ কাজ করবে। عَمَلاً ঃ কর্ম। صَالِحاً ঃ সৎ। فَأُوْلَئِكَ ঃ তখন
ঐ সব লোকদেরকে। يُبَدِّلُ ঃ বদলিয়ে দেবেন। اللهُ ঃ আল্লাহ। سَيِّئَاتِهِمْ
ঃ তাদের অন্যায়কে। حَسَنَاتٍ ঃ ভালোয়। وَ ঃ আর। كَانَ ঃ হলেন। اللهُ
ঃ আল্লাহ। غَفُوْراً ঃ ক্ষমাশীল। رَّحِيْماً ঃ মেহেরবান। وَ ঃ আর। مَنْ
ঃ যে। تَابَ ঃ তাওবা করে। وَ ঃ আর। عَمِلَ ঃ কাজ করে। صَالِحاً ঃ

নেকীর। فَإِنَّهُ ঃ তখন সে নিশ্চয়ই। يَتُوْبُ ঃ ফিরে আসে। إِلَى দিকে। اللهِ ঃ আল্লাহ। مَتَابًا ঃ অনুতপ্ত হয়ে। وَ ঃ এবং। الَّذِيْنَ ঃ যারা। لَا ঃ না। يَشْهَدُوْنَ ঃ সাক্ষ্য দেয়। الزُّوْرَ ঃ মিথ্যার। وَ ঃ এবং। إِذَا ঃ যখন। مَرُّوْا ঃ অতিক্রম করে। بِاللَّغْوِ ঃ কোন অর্থহীন বিষয়কে। مَرُّوْا ঃ তারা অতিক্রম করে। كِرَامًا ঃ ভদ্রভাবে। وَ ঃ এবং। الَّذِيْنَ ঃ তাদেরকে। إِذَا ঃ যখন। ذُكِّرُوْا ঃ স্মরণ করান হয়। بِآيَاتِ ঃ আয়াতগুলোকে। رَبِّهِمْ ঃ তাদের রবের। لَمْ ঃ না। يَخِرُّوْا ঃ তারা পড়ে থাকে। عَلَيْهَا ঃ তার উপর। صُمًّا ঃ অন্ধ। وَ ঃ ও। عُمْيَانًا ঃ বধির হয়ে। وَ ঃ এবং। الَّذِيْنَ ঃ যারা। يَقُوْلُوْنَ ঃ বলে। رَبَّنَا ঃ হে আমাদের রব। هَبْ ঃ বানিয়ে দাও। لَنَا ঃ আমাদের জন্য। مِنْ ঃ থেকে। أَزْوَاجِنَا ঃ আমাদের স্ত্রীদেরকে। وَ ঃ ও। ذُرِّيَّاتِنَا ঃ আমাদরে বংশধরদেরকে। قُرَّةَ ঃ শীতলতা (অর্থাৎ শান্তি)। أَعْيُنٍ ঃ চক্ষুসমূহের। وَ ঃ এবং। اجْعَلْنَا ঃ আমাদেরকে বানাও। لِلْمُتَّقِيْنَ ঃ মুত্তাকীদের জন্যে। إِمَامًا ঃ নেতা।

নামকরণ ঃ এ সূরার প্রথম আয়াত نَزَّلَ الْفُرْقَانَ এর "আল ফুরকান" শব্দটিকে ইহার নাম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময় ও কাল ঃ এ সূরাটি রাসূল (স) মক্কায় অবস্থানকালের মাঝামাঝি সময় অবতীর্ণ হয়। (তাফসীরে কাবীর)

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য ঃ পবিত্র কুরআন, মুহাম্মদ (স) এবং তার পেশকৃত আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে মক্কার কাফিরদের তরফ থেকে যেসব

সন্দেহ, সংশয় ও প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। তার উপযুক্ত জবাব দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে সত্য দীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার মারাত্মক পরিণতির কথাও স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া মুমিনদের নৈতিক বৈশিষ্ট্যের একটি চিত্র অংকন করা হয়েছে। যাতে জনগণ তার মাপকাঠিতে পরখ করে দেখতে পারে কে খাঁটি ও কে কৃত্রিম। রাসূলের প্রশিক্ষণের ফলে একদল সৎ লোক তৈরি হয়েছে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য কুরআনের এ কর্মসূচী চালু থঅকলে ভবিষ্যতেও সৎ লোক তৈরী করা সম্ভব। কিন্তু জাহিলিয়াতের ধারক বাহকরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এ কর্মসূচীকে বাধা প্রদান করেছে, ভবিষ্যতেও করবে।

আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় বান্দাদেরকে 'ইবাদুর রহমান' রহমানের বান্দা উপাধি দিয়েছেন। এটা হচ্ছে তার প্রিয় বান্দাদের সম্মান সূচক পদবী। আল্লাহ তাআলা একদিকে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে অপর দিকে আনুগত্যের দিক দিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যের মাপকাঠিতে বান্দাদের মধ্যে কেউ কেউ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়ে যায়। যারাই স্বেচ্ছায় নিজের অস্তিত্ব, নিজের সমস্ত কামনা বাসনা ও কর্মকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী করে দেয়, এ ধরনের বিশেষ বান্দাদেরকে আল্লাহ তায়ালা নিজের বান্দা বলে অভিহিত করেছেন।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলী ও আলামত

আলোচ্য আয়াত সমূহে আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তেরটি গুণ ও আলামত বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বাস সংশোধন, দৈহিক ও আর্থিক যাবতীয় ব্যক্তিগত কর্মে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান ও ইচ্ছার অনুসরণ, অপর মানুষের সাথে সামাজিকতা ও সম্পর্ক স্থাপনের সাথে আল্লাহভীতি যাবতীয় গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াস, নিজের সাথে সন্তান সন্ততি ও স্ত্রীদের সংশোধন ইত্যাদি বিষয়বস্তু শামিল আছে।

আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا

অনুবাদ

রহমান-এর বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের সাথে কথা বলতে আসে তখন তারা বলে, সালাম।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রথম গুণ ঃ তাদের সর্ব প্রথম গুণ عباد হওয়া। عباد শব্দটি عبد এর বহুবচন অর্থ বান্দা, দাস, যে তার প্রভুর মালিকানাধীন এবং যার সমস্ত ইচ্ছা ও ক্রিয়াকর্ম প্রভূর আদেশ ও মর্জির উপর নির্ভরশীল। যে নিজের কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না কেবল তিনিই রহমানের বান্দা হওয়ার উপযুক্ত।

দ্বিতীয় গুণ ঃ তারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাচল করে। هون শব্দের অর্থ এখানে স্থিরতা, গাম্ভীর্য, বিনয়। যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে তারা অহংকার ও বড়াই করে চলে না। অত্যাচারী, স্বৈরাচারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের মত দাপট দেখায় না। বরং তাদের চালচলন শরীফ সুস্থ্য স্বভাব ও নেক প্রকৃতি সম্পন্ন মানুষের মতই হয়। নম্রভাবে চলা ফেরার অর্থ এই নয় যে, সে দুর্বল ও রোগাক্রান্ত লোকদের মত চলাফেরা করবে। রাসূল (স) নিজে দৃঢ় পদক্ষেপে চলাচল করতেন। হযরত ওমর (রা) জনৈক যুবককে খুব ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি অসুস্থ? সে বললঃ না, তিনি তার প্রতি চাবুক উঠালেন এবং শক্তি সহকারে চলার আদেশ দিলেন। (ইবনে কাসীর)

মানুষের চাল-চলনে এমন কি গুরুত্ব রয়েছে, যার জন্য আল্লাহ তাআলা তার নেক বান্দাদের গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে একথাটি উল্লেখ করলেন তা গভীর ভাবে চিন্তা করা আবশ্যক। এই বিষয়টি গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে স্পষ্ট বুঝা যাবে যে, মানুষের চাল-চলন তার শুধু গতিবিধিরই নাম নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে তাই তার মানসিকতা, তার স্বভাব-প্রকৃতি ও অন্তর্নিহিত ভাবধারার বাস্তব প্রতীক হয়ে থাকে। একজন নির্লজ্জ ব্যক্তির চাল-চলন, একজন গুন্ডা বদমাইশ ব্যক্তির চাল-চলন একজন অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির চাল-চলন, একজন দাম্ভিক ও আত্মম্ভরিতাসম্পন্ন ব্যক্তির চাল-চলন,

একজন মর্যাদাবান ও সুসভ্য ব্যক্তির চাল-চলন, একজন গরীব মিসকীন ব্যক্তির চাল-চলন এবং এমনি ভাবে অন্যান্য বহু রকমের মানুষের চাল-চলন এতই বিভিন্ন হয়ে থাকে যে, দেখে কোন ধরনের চাল-চলনের পিছনে কোন্ ধরনের ব্যক্তি চরিত্র রয়েছে তা অতিস্পষ্ট ভাবেই বুঝা যায়। অতএব আয়াতের বক্তব্য হলো এই যে, রহমানের বান্দাহগণকে তো তোমরা সাধারণ মানুষের মধ্যে চলা ফিরা করতে দেখে পূর্ব পরিচিতি ছাড়াই আলাদা করে চিনে নিতে পারবে, বুঝতে পারবে এরা কি ধরনের লোক। তাদের বন্দেগী, তাদের মানসিকতা এবং তাদের স্বভাব চরিত্রকে কিরূপ গঠন করেছে, তা তাদের চাল-চলন হতে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠে। একজন মানুষ তা দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই জানতে পারে যে, এরা অত্যন্ত ভদ্র, সহিষ্ণু ও সহানুভূতি সম্পন্ন লোক, তাদের দ্বারা কোন অনিষ্ট হওয়ার আশংকা করা যায় না। (তাফহীম)

তৃতীয় গুণ ঃ

خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَماً

অর্থাৎ যখন অজ্ঞতাসম্পন্ন লোক তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা বলে সালাম। এখানে جَاهِلُوْنَ শব্দের অনুবাদ 'অজ্ঞতাসম্পন্ন' করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এর অর্থ বিদ্যাহীন ব্যক্তি নয়; বরং যারা মুর্খতার কাজ ও মুর্খতাপ্রসূত কথাবার্তা বলে, যদিও বাস্তবে বিদ্বানও বটে। সালাম শব্দ বলে এখানে প্রচলিত সালাম বুঝানো হয়নি; বরং নিরাপত্তার কথা বুঝানো হয়েছে। কুরতুবী নাহ্হাম থেকে বর্ণনা করে যে, এখানে সালাম শব্দটি تسليم থেকে নয়; বরং سلم থেকে উদ্ভুত; যার অর্থ নিরাপত্তা। উদ্দেশ্য এই যে, মুর্খদের জওয়াবে তারা নিরাপত্তার কথাবার্তা বলে, যাতে অন্যরা কষ্ট না পায় বরং তারা নিজেরা গোনাহগার না হয়। হযরত মুজাহিদ, মুকাতিল প্রমুখ থেকে এ তাফসীরই বর্ণিত আছে। (মাআরেফুল কুরআন)

রহমানের বান্দাহদের নীতি এই যে, তারা গালাগালের জওয়াবে গালাগাল, অন্যায় দোষারোপের জওয়াবে অন্যায় দোষারোপ এবং বাজে কথাবার্তার জওয়াবে অনুরূপ বাজে কথা বলে বেড়ায় না; বরং যারা এরূপ

আচরণ করে তাদেরকে তারা সালাম দিয়ে অন্যত্র চলে যায়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا سَمِعُوْا اللَّغْوَ أَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِى الْجَاهِلِيْنَ

যখন তারা কোন বাজে কথাবার্তা শুনতে পায় তখন তারা তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলেঃ ভাই, আমাদের কাজ আমাদের জন্য, আর তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। তোমাদের প্রতি সালাম, জাহেলদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। (সূরা আল- কাসাস ঃ ৫৫)

وَالَّذِيْنَ يَبِيتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَّقِيَاماً

অনুবাদ

এবং তারা রাত অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান থেকে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

চতুর্থ গুণ ঃ জাহিলিয়্যাতের যুগে মানুষ রাত্রি বেলায় আমোদ ফূর্তি ও লালসা চরিতার্থ, নাচ-গানের অনুষ্ঠান, খেল-তামাশা, গল্পের আসর জমানো কিংবা চুরি ডাকাতি করে অতিবাহিত করতো। এদের মধ্যেই যারা রাসূলের দাওয়াত পেয়ে ইসলামের সুমহান আদর্শের ছায়া-তলে সমবেত হয়ে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হন। এ সকল আল্লাহর প্রিয় বান্দারা দিনের বেলায় শিক্ষাদান, ইসলামের প্রচার ও জিহাদে লিপ্ত থাকতেন। অপর দিকে রাতের বেলায় আল্লাহর দরবারে দণ্ডায়মান অবস্থায়, বসা অবস্থায় ও শয়ন অবস্থায় ইবাদত বন্দেগী ও দোয়া প্রার্থনায় অতিবাহিত করতেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে তাদের পরিচ্ছন্ন জীবনের এ দিকগুলো এভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُوْنَ

তাদের পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ সুখ-শয্যা হতে আলাদা হয়ে থাকে, তারা তাদের রবের প্রতি ভয় ও আশা পোষণ করে তাদের রবকে ডাকতে থাকে। (সুরা আস-সিজদা ঃ ১৬)

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

এই জান্নাতী লোকেরা ছিল তারাই যারা রাত্রে বেলায় খুব কমই ঘুমায়। এরা ভোর রাত্রে মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। (সূরা জারিয়াত ঃ ১৭-১৮)

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوْ رَحْمَةَ رَبِّهِ

সেই ব্যক্তির পরিণাম কি কোন মুশরিক ব্যক্তির অনুরূপ হতে পারে যে হবে আল্লাহর অনুগত, হুকুম পালনকারী, রাত্রি কালে আল্লাহর জন্য সিজদা করে ও দাঁড়িয়ে সময় কাটায়, পরকালকে ভয় করে, স্বীয় রব এর রহমত পাওয়ার আশায় আশান্বিত হয়ে থাকেন। (সূরা আয-যুমার ঃ ৯)

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً

অনুবাদ

এবং তারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচাও। উহার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

পঞ্চম গুণ ঃ আল্লাহর প্রিয় বান্দারা দিন-রাত আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও এভাবে দাবী বা অহংকার করে না যে, তাদের ইবাদতের বদৌলতে তারা জান্নাতে দাখিল হয়ে যাবে বরং তারা তাদের নেক আমল বৃদ্ধি করতে থাকে ও আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর কাছে তাদের অক্ষমতাকে তুলে ধরে প্রার্থনা করতে থাকে "হে আল্লাহ আমাদের ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাবকে হটিয়ে দাও। তোমার অনুগ্রহ ও দয়ার উপরই আমরা নির্ভরশীল। তোমার

দয়া ছাড়া আমাদের কোন ইবাদত আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে না।"

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَاماً

অনুবাদ

যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ষষ্ঠ গুণ ঃ আরবের লোকদের মধ্যে দুই ধরনের চরিত্রের লোক পাওয়া যেতো। এক ধরনের লোক ছিল, যারা আরাম আয়েশ, মদপান, জুয়া খেলা সহ অনৈতিক কাজে উচ্চবিলাসী খাবার, পোষাক ও জাঁকজমকপূর্ণ সাজসজ্জায় অর্থ ব্যয় করতো। আরেক ধরনের লোক ছিল যারা পাই পাই করে অর্থ সংগ্রহ করতো, না নিজে খেতো না সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন ও জনকল্যাণ মূলক কাজে ব্যয় করতো। আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না কৃপণতা করে না; বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে। আয়াতে اسراف এবং اقتار শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

اسراف এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। শরীয়তের পরিভাষায় হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদা, ইবনে জুরায়জের মতে আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে ব্যয় করাই اسراف বা অপব্যয়; যদিও তা এক পয়সা হয়। কেউ কেউ বলেন- বৈধ ও অনুমোদিত কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভূক্ত। কেননা, تبذير তথা অনর্থক ব্যয় করা কুরআন ও হাদীস দ্বারা হারাম ও গোনাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। (সূরা বণী ইসরাঈল ঃ ২৭)

এ দিক দিয়ে এ তাফসীরের সারর্মমও হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখের তাফসীরের অনুরূপ হয়ে যায়; অর্থাৎ গোনাহের কাজে যা-ই করা হয়, তা অপব্যয়। (মাযহারী)

ইসলামের দৃষ্টিতে ইসরাফ বলা হয় তিনটি কাজকে

(১) না-জায়েজ কাজে অর্থ খরচ করা।

(২) জায়েজ কাজে অর্থ খরচ করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করা।

(৩) নেককাজে অর্থ খরচ করা কিন্তু আল্লাহর উদ্দেশ্যে নয়, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে।

اقتار শব্দের অর্থ ব্যয়ে ত্রুটি ও কৃপণতা করা। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ যে সব কাজে আল্লাহ ও রাসূল ব্যয় করার আদেশ দেন, তাতে কম ব্যয় করা।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের গুণ এই যে, তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপব্যয় ও ত্রুটির মাঝখানে সততা ও মিতাচারের পথ অনুসরণ করে।

রাসূলে কারীম (স) বলেন ঃ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ قَصْدَةٌ فِيْ مَعِيْشَتِهِ অর্থাৎ ব্যয় করতে গিয়ে মধ্যবর্তীতা অবলম্বন করা মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। (আহমদ, ইবনে কাসীর)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূল (স) বলেন- مَا عَالَ مَنْ اِقْتَصَدَ যে ব্যক্তি ব্যয় কাজে মধ্যবর্তীতা ও সমতার উপর কায়েম থাকে, সে কখনো ফকির ও অভাবগ্রস্থ হয় না। (আহমদ, ইবনে কাসীর)

وَالَّذِيْنَ لا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَاماً

অনুবাদ

এবং তারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা

নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে, সে শাস্তি ভোগ করবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

সপ্তম গুণ ঃ এবং তারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না। এখানে গুনাহের ও অবাধ্যতার মূলনীতির কথা বলা হয়েছে। তদানীন্তন আরবের অধিবাসীরা তিনটি বড় গুনাহে নিমজ্জিত ছিল।

১. শিরক। ২.নর হত্যা। ৩.যিনা।

ইসলামের আবির্ভাবের পর এ সকল কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকার জন্য আরব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। শিরক করা কবীরা গুনাহ। এ গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى إِثْماً عَظِيْماً

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে লোক তার সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।" (সূরা আন-নিসা ঃ ৪৮)

কেননা, এটি হচ্ছে বড় গুনাহ। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়।" (সূরা কাহাফ ঃ ১১০)

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ أَحَداً

যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে। (সূরা আল-কাহাফ ঃ ১১০)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূল (স) কে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থাপন করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাস করে ঃ তারপর কোনটি? জবাবে তিনি বলেন ঃ তুমি তোমার সন্তানকে এ ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সাথে খাদ্য খাবে। পুনরায় লোকটি প্রশ্ন করেঃ তাপর কোন পাপটি সবচেয়ে বড়? তিনি উত্তর দেন ঃ ঐ পাপটি এই যে, তুমি তোমার প্রতিবেশির স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়। হযরত আব্দুল্লাহ (রা) বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ لا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ الـنَّفْسَ الَّتِـيْ

حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يفعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَاماً

এই আয়াত দ্বারা রাসূল (স)-এর উক্তিকে সত্যায়িত করা হয়েছে। (ইবনে কাসীর ঃ ২৮৫)

বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (স) বলেছিলেন ঃ তোমরা চারটি গুনাহ হতে বহু দূরে থাকবে। সেগুলো হলো ঃ তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করবে না। ব্যভিচার করবে না এবং চুরি করবে না। (নাসাঈ শরীফ)

অষ্টম গুণ ঃ وَلاَ يَقْتُلُـوْنَ الـنَّفْسَ তারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না। এখান থেকে কার্যগত গোনাহসমূহের মধ্যে কতিপয় প্রধান ও কঠোর গোনাহ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এসব গোনাহর কাছে যায় না। তারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না।

নবম গুণ ঃ وَلاَ يَزْنُـوْنَ "এবং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয় না।" ব্যভিচার একটি অশ্লীল কাজ এর দ্বারা সমাজ কলুষিত হয় এবং বিশৃংখলা দেখা দেয়। আরবের জাহিলিয়্যাতের যুগে সমাজে এর প্রচলন ছিল। এই কুৎসিত কাজ থেকে বিশ্ব মানবতাকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলা এ কাজের নিকটবর্তী হতেও নিষেধ করেছেন। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنَا اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّ سَاءَ سَبِيْلاً

তোমরা যেনার নিকটবর্তীও হয়ো না নিশ্চয় তা একটি অশ্লীল কাজ ও অবৈধ পন্থা। বিশ্বাস ও কর্মের এই তিনটি বড় গোনাহ্ বর্ণনা করার পর আয়াতে এরশাদ হচ্ছে, وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَاماً অর্থাৎ যে ব্যক্তি উল্লেখিত গোনাহসমূহ করবে, সে তার শাস্তি ভোগ করবে। এ স্থলে আবু উবায়দা اثام শব্দের তাফসীর করেছেন গোনাহর শাস্তি। কেউ কেউ বলেন اثام জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম, যা নির্মম শাস্তিতে পূর্ণ। কোন কোন হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। (মাযহারী)

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا

অনুবাদ

কিয়ামতের দিন উহার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে তারা লাঞ্ছনা সহকারে পড়ে থাকবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ইহার দুইটি তাৎপর্য হতে পারে। একটি এই যে, আযাবের ধারাবাহিকতা ব্যহত হবে না, অবিচ্ছিন্নভাবে ইহা জারী থাকবে। আর দ্বিতীয় তাৎপর্য এই যে, ব্যক্তি কুফরী, শিরক কিংবা নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহীতার সংগে সংগে নরহত্যা, যিনা ও অন্য বড় বড় গুনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে উপস্থিত হবে, তাকে বিদ্রোহের শাস্তি দেয়া হবে এবং এক একটি অপরাধের শাস্তি পাবে আলাদা আলাদাভাবে। তার ছোট বড় সব গুনাহই হিসাবে গণনা করা হবে। তার একটি ভুল, অপরাধও ক্ষমা করা হবে না। নরহত্যার শাস্তি একটি হবে না, প্রত্যেকটি নরহত্যার শাস্তি তাকে আলাদা ভাবে ভোগ করতে হবে। যেনার শাস্তিও একটি হবে না যত বারই সে এ অপরাধ করেছে, তার শাস্তি সে স্বতন্ত্র ভাবে পাবে। অন্য অপরাধও গোনাহের ব্যাপারেও এই নীতি অনুসৃত হবে।

إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْراً رَّحِيْماً، وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَاباً

অনুবাদ

তারা নহে, যারা তাওবা করে ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পূণ্যের দ্বারা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এরূপ কঠোর অপরাধী যদি তাওবা করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে সৎকর্ম করতে থাকে, তবে আল্লাহ তাআলা তাদের মন্দ কর্মসমূহকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাওবার পর তাদের আমলনামায় পুণ্য থেকে যাবে। কেননা, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা এই যে, শিরক ও কুফর অবস্থায় যত পাপই করা হোক না কেন, তওবা করতঃ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সেসব বিগত পাপ মাফ হয়ে যাবে। কাজেই অতীতে তাদের আমলনামা যদিও গোনাহ ও মন্দ কর্মে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু এখন ঈমান গ্রহণ করার কারণে সেগুলো সব মাফ হয়ে গেছে এবং গোনাহ ও মন্দ কর্মের স্থান ঈমান ও সৎকর্ম দখল করে নিয়েছে। মন্দ কর্মসমূহকে পূণ্যে পরিবর্তিত করার এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, সায়ীদ ইবনে জুবায়র, মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। (মাযহারী।)

যারা জীবনে নানা অপরাধের কলংকে কলংকিত হওয়া সত্ত্বেও এখন তারা নিজেদের অপরাধ থেকে মুক্তি পেতে তাওবা করার ইচ্ছা পোষণ করে তাদের জন্য এ আয়াতে সুসংবাদ রয়েছে। আর এ ঘোষণার মধ্যেই আরবের লক্ষ লক্ষ পাপী মানুষ মুক্তির শাশ্বত পথের সন্ধান পেয়েছিল। চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। তাদের বিবেকে অন্যায় ও

পাপের পথ পরিহার করে ন্যায় পথ অনুসরণের অনুভূতি জাগ্রত হল। এ ঘোষনায় তাদেরকে আশার আলো দেখিয়েছিল। আর যদি তাদেরকে নিরুৎসাহিত করা হত তা হলে তারা পাপের পথ পরিহার করে মুক্তির রাজপথ থেকে বঞ্চিত হত। চির দিন তারা অন্যায়ের ঘুর্ণাবর্তে আবর্তিত হত। কোন দিনই তাদেরকে সংশোধন করা এবং ন্যায়ের পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হতো না। অপরাধী মানুষকে ক্ষমা লাভ অবশ্যই অপরাধের চক্র হতে রক্ষা করতে পারে। নিরাশ করে দেয়া হলে নৈরাশ্য তাদেরকে ইবলিস বানিয়ে ফেলত। তাওবা করার অবাধ সুযোগের এই নিয়ামত আরবের ধ্বংসোন্মুখ মানব সাধারণকে কিভাবে অন্যায় হতে ফিরিয়ে রাখতে সামর্থ হয়েছিল, নবী কারীম (স) এর যামানার অনেক ঘটনা হতেই সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর ও তাবারানী। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি একদিন এশার সালাত মসজিদে আদায় করে ফিরে আসছিলাম। দেখতে পেলাম, আমার দরজায় একটি স্ত্রীলোক দাড়িয়ে আছে। আমি তাকে সালাম জানিয়ে আমার ঘরে চলে গেলাম এবং দরজা বন্ধ করে নফল সালাত আদায় করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর স্ত্রীলোকটি দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। আমি উঠে দরজা খুললাম ও সে কি চায় তা জিজ্ঞাসা করলাম। স্ত্রীলোকটি বলল ঃ আমি আপনার নিকট একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। প্রশ্নটি এই যে, আমার দ্বারা যেনা সংগঠিত হয়েছে, গর্ভ হয়েছে, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর তাকে মেরে ফেলেছি। এখন আমি জানতে চাই যে, আমার এই গুনাহের ক্ষমা পাওয়ার কোন উপায় আছে কি? আমি বললাম, কক্ষণই নয়। সে বড় দুঃখ ও বেদনা ভারাক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে চলে গেল এবং বলতে লাগলো ঃ "বড়ই দুঃখ এরূপ সৌন্দর্য জাহান্নামে জ্বলবার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল।" সকাল বেলা নবী কারীম (সা) এর সাথে সালাত যখন শেষ করলাম, তখন নবী কারীম (স) কে রাতের ঘটনাটি শুনালাম। তিনি বললেন ঃ "তুমি খুব ভুল জবাব দিয়েছো আবু হুরাইরা! কুরআনের উল্লেখিত এ আয়াতটি কি তুমি পড় নাই।

হুজুরের এ জবাব শুনে আমি বের হলাম এবং সে স্ত্রী লোকটিকে খোঁজ করতে লাগলাম। রাতে এশার সময় তাকে পাওয়া গেল। আমি তাকে এই

শুভ সংবাদ শুনালাম এবং বললাম যে, নবী কারীম (স) তোমার প্রশ্নের এই জবাব দিয়েছেন। সে ইহা শুনে সিজদায় পড়ে গেল এবং বলতে লাগলো ঃ "শোকর" সেই আল্লাহর, যিনি আমার জন্য ক্ষমা লাভের দুয়ার খোলা রেখেছেন।" পরে সই স্ত্রীলোকটি গুনাহ হতে তাওবা করল এবং নিজের দাসীকে তাহার পুত্রসহ আযাদ করে দিল। (তাফহীম)

وَالَّذِيْنَ لاَ يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَاماً

অনুবাদ

এবং যারা মিথ্যার সাক্ষী হয় না। আর কোন অর্থহীন বিষয়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে হলে তারা শরীফ মানুষের মতই অতিক্রম করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

দশম গুণ ঃ এর দুটি অর্থ ও তাৎপর্য। প্রথমটি হচ্ছে তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনার বিপরীত মত প্রকাশ করে না। দ্বিতীয়ত তারা মিথ্যা ও বাতিল মজলিশে যোগদান করে না। সব চেয়ে মিথ্যা ও বাতিল হচ্ছে শিরক ও কুফর। এর পর সাধারণ পাপ কর্ম মিথ্যা কাজ। আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এরূপ মজলিশে যোগদান করা থেকেও বিরত থাকে। সব বাতিল গোনাহ ও অন্যায় প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা, ইহা শুধু বাহ্যিক চাকচিক্য ও জাঁকজমকের দ্বারাই লোকদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। মুমিন ব্যক্তি সত্যকে চিনতে পারে বলেই বাতিল কাজের নিকটবর্তী হয় না।

একাদশ গুণ ঃ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَاماً অর্থাৎ যদি অনর্থক ও বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে তারা ঘটনাক্রমে কোনদিন গমন করে, তবে গাম্ভীর্য ও ভদ্রতা সহকারে চলে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের মজলিসে তারা যেমন ইচ্ছাকৃত ভাবে যোগদান করে না, তেমনি যদি ঘটনাচক্রে তারা এমন মজলিসের কাছ দিয়েও গমন করে, তবে পাপাচারের এসব মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্রতা বজায় রেখে চলে যায়। অর্থাৎ মজলিসের কাজকে মন্দ ও ঘৃণার্হ জানা সত্ত্বেও পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না এবং নিজেদেরকে তাদের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে অহংকারে লিপ্ত হয় না।

وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا

অনুবাদ

এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে তার প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

এই প্রিয় বান্দাগণকে যখন আল্লাহর আয়াত ও আখেরাতের কথা স্মরণ করানো হয় তখন তারা এসব আয়াতের প্রতি অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় মনোযোগ দেয় না; বরং শ্রবণ শক্তি ও তদানুযায়ী আমল করে। অনুধাবন ও বোকা লোকদের ন্যায় এরূপ আচরণ করে না যে, তারা যেন শোনেইনি কিংবা দেখেইনি। এই আয়াতে দুটি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। (এক) আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর পতিত হওয়া অর্থাৎ গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করা। এটা প্রশংসনীয়, কাম্য ও বিরাট পূন্য কাজ। (দুই) অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় পতিত হওয়া, অর্থাৎ কুরআনের আয়াত সমূহের প্রতি মনোনিবেশ করা হয় বটে, কিন্তু আমলের ব্যাপারে এমন করা যেমন শোনেইনি ও দেখেইনি অথবা আমলও করা হয়, কিন্তু বিশুদ্ধ মূলনীতি এবং সাহাবা তাবেয়ীদের মতামতের খেলাফ নিজের মতে কিংবা জনশ্রুতির অনুসরণে ভ্রান্ত আমল করা। এটাও এক রকম অন্ধ-বধির হয়েই পতিত হওয়ার পর্যায়ভুক্ত। কিংবা তারা এমন লোক নয় যে, তারা আল্লাহর আয়াত শুনেও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে না; বরং তারা তো উহার গভীর প্রভাব মনমগজে গ্রহণ করে যে হেদায়াত তাদেরকে দেয়া হয় তারা তা পালন করে, যা ফরজ করা হয়েছে তা ফরজ হিসাবে আদায় করে, যাকে খারাপ বলা হয়েছে, তাকে খারাপ জেনে তা থেকে দূরে সরে থাকে। আর যে সব আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে তার ভয়ে তারা সদা কম্পমান থাকে।

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا

অনুবাদ

এবং যারা প্রার্থনা করে "হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি দান কর যারা হবে আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদেরকে মুত্তাকী লোকদের জন্য ইমাম বানাও।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এখানে এই দুআ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ কেবল নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না; বরং তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরও আমল সংশোধন এবং চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টারই অংশ হিসেবে তাদের সৎকর্ম পরায়ণতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। এখানে এ দুআয় এ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাকওয়া ও আনুগত্যে আমরা যেন অন্যের থেকে এগিয়ে যাই। নেকি ও কল্যাণের কাজে সকলের অপেক্ষা বেশী অগ্রসর হই। আর আমাদেকে শুধু নেক চরিত্রবানই করে না। সাথে সাথে আমরা যেন নেক চরিত্রবান লোকদের নেতাও হতে পারি। আমাদের দ্বারা যেন দুনিয়ায় নেকী, সভ্যতা ও আল্লাহর অনুগত্যের কাজ যেন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। একথার উল্লেখ এখানে এ জন্য করা হয়েছে যে, এ লোকেরা ধন-সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়ে নয়, নেকী ও পরহেযগারীর ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরের তুলনায় যেন বেশী অগ্রসর হওয়ার জন্য চেষ্টায় রত থাকেন।

শিক্ষা

১. দীন প্রতিষ্ঠার কাজ করলে একদিন তা বিজয় লাভ করবেই।
২. হযরত মুহাম্মদ (স)-কে নবী হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া না দেয়ায় কিছুই আসে যায় না। আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।
৩. ইসলাম বিরোধীদের প্রতি কঠোর ও নিজেদের প্রতি সদয় হতে হবে।
৪. রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দীনকে অন্য সকল দীনের উপর বিজয়ী করা।
৫. যারা ঈমান গ্রহণ করে সৎকর্ম করবে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে মহাপুরস্কার প্রদান করবেন।

৫

ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা

২৯, সূরা আল-আনকাবূত

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত-৬৯, রুকূ-৭

আলোচ্য আয়াত ঃ ১-৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(١) الٓمٓ (٢) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُّتْرَكُوْا أَنْ يَقُوْلُوْا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ (٣) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ (٤) أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُوْنَا سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ (٥) مَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (٦) وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ (٧) وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অনুবাদ ঃ (১) আলিফ-লাম- মীম, (২) মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি' শুধু এটুকু কথা বললেই ছেড়ে দেয়া হবে তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? (৩) অথচ তাদের আগে যারা ছিল তাদের সবাইকে আমি পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে যে, ঈমানের দাবীতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী। (৪) যারা মন্দ কর্ম করে তারা কি এ ধারণা করে আছে যে, তারা আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে? তাদের ফায়সালা খুবই মন্দ। (৫) যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে তার জানা উচিত যে, আল্লাহর নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে। আর তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন। (৬) যে চেষ্টা সাধনা করবে সে তো নিজের ভালোর জন্যই করবে। নিশ্চয়ই গোটা সৃষ্টি জগতের কারো কাছে আল্লাহর কোনো ঠেকা নেই। (৭) যারা ঈমান এনেছে নেক আমল করেছে আমি তাদের সব দোষ তাদের থেকে দূর করে দিব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেবো।

শব্দার্থ ঃ الٓمٓ ঃ আলিফ- লাম- মীম। أَحَسِبَ النَّاسُ ঃ মানুষ কি মনে করে। أَنْ يُّتْرَكُوْا ঃ তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে। أَنْ يَّقُوْلُوْا ঃ বলবে। اٰمَنَّا আমরা ঈমান এনেছি। وَهُمْ ঃ এবং তাদের। لَا يُفْتَنُوْنَ ঃ পরীক্ষা করা হবে না? وَلَقَدْ فَتَنَّا ঃ অবশ্যই আমি পরীক্ষা করেছি। الَّذِيْنَ ঃ যারা। مِنْ قَبْلِهِمْ তাদের পূর্বে ছিল। فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ ঃ আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে জেনে নিবেন। الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ঃ যারা সত্যবাদী وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ ঃ অবশ্যই জেনে নিবেন কারা মিথ্যাবাদী। أَمْ حَسِبَ ঃ তারা কি ধারণা করে? الَّذِيْنَ ঃ যারা يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ঃ মন্দ কাজ করে। أَنْ يَّسْبِقُوْنَا ঃ আমাকে ছাড়িয়ে যাবে। سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ঃ তাদের ফয়সালা খুবই মন্দ। مَنْ ঃ যে। كَانَ يَرْجُوْ

أَجَـلَ اللّٰـهِ ঃ কামনা করে। لِقَاءَ اللّٰهِ ঃ আল্লাহর সাক্ষাত। فَـإِنَّ ঃ নিশ্চয়ই। أَجَـلَ اللّٰـهِ ঃ আল্লাহর নির্ধারিত সময়। لَآتٍ ঃ অবশ্যই আসবে। وَهُوَ ঃ তিনি। السَّمِيْعُ সর্বশ্রোতা। الْعَلِيْمُ ঃ সর্ব জ্ঞানী। وَمَنْ جَاهَـدَ যে চেষ্টা-সাধনা করে। فَإِنَّمَـا ঃ সে তো সাধনা করে। لِنَفْسِـهِ ঃ নিজের জন্য। إِنَّ اللّٰهَ ঃ নিশ্চয়ই يُجَاهِـدُ আল্লাহ। لَغَنِيٌّ ঃ অমুখাপেক্ষী। عَنِ الْعَالَمِيْنَ ঃ সৃষ্টি জগত থেকে। وَالَّـذِيْنَ ঃ নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে। وَعَمِلُـوا الصَّـالِحَاتِ ঃ নেক আমল آمَنُـوْا করে। لَنُكَفِّـرَنَّ ঃ তাদের থেকে দূর করে দেব। سَـيِّئَاتِهِمْ ঃ তাদের মন্দ কাজগুলো। وَلَنَجْـزِيَنَّهُمْ ঃ অবশ্যই তাদের প্রতিদান দিব। أَحْسَـنَ উৎকৃষ্টতর। الَّذِيْ ঃ যা। كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ঃ তারা আমল করত।

সূরার নামকরণ

এ সূরার ৪১ নং আয়াতের আনকাবূত শব্দের উপর ভিত্তি করে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ

আনকাবূত শব্দের অর্থ ঃ মাকড়সা। মহান আল্লাহ এ আয়াতে বলেছেন ঃ যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়।

নাযিল হওয়ার সময় কাল

এ সূরাটি হাবশায় হিজরাতের কিছু আগে মুসলমানদের কঠিন সংকটকালে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তখন মক্কায় মুসলমানরা মহা বিপদ-মুসিবতের মধ্যে অবস্থান করছিল। সে সময় কাফেরদের পক্ষ থেকে পূর্ণ শক্তিতে চলছিল ইসলামের বিরোধিতা ও মুমিনদের ওপর কঠোর জুলুম-

নিপীড়ন। অবশেষে কতিপয় নারী পুরুষ মক্কা ছেড়ে হাবশায় হিজরাত করতে বাধ্য হয়েছিল।

সূরার শুরুতে মুনাফিকদের কথা উল্লেখ থাকায় প্রথম রুকুটি কেউ কেউ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে মনে করেন; কিন্তু এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। অথচ এখানে যে সব লোকের মুনাফিকীর কথা বলা হয়েছে তারা কেবল কাফেরদের জুলুম, নির্যাতন ও কঠোর শারীরিক নিপীড়নের ভয়ে মুনাফিকী অবলম্বন করছিল। ঈমান আনার পর তারা পরীক্ষায় টিকতে পারেনি। এ দুর্বল মুমিনরাও এক ধরনের মুনাফিক। এ ধরনের মুনাফিক মক্কায় ছিল, মদীনায় ছিল না।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

কাফিরদের ইসলামের বিরোধিতা এবং মুসলমানদের নির্যাতনের অবস্থায় মহান আল্লাহ্ এক দিকে সাচ্চা ঈমানদারদের মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা, সাহস ও অবিচলতা সৃষ্টি করার এবং অন্যদিকে দুর্বল ঈমানদারদেরকে লজ্জা দেবার জন্য এ সুরাটি নাযিল করেন। এই সাথে এর মধ্যে মক্কায় কাফিরদেরকেও এ মর্মে কঠোর ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, নিজেদের মধ্যে এমন পরিণতি ডেকে এনো না সত্যের সাথে শত্রুতা পোষণকারীরা যুগে যুগে যার সম্মুখীন হয়ে এসেছে।

এ সূরায় অতীতের নবীগণের বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করে ঈমানদারদেরকে কাফিরদের জুলুম সহ্য করার জন্য সাহস দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী নবীদেরকে দেখো তাঁরা কেমন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। দীর্ঘকাল নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য করা হয়েছে। কাজেই তোমরাও ভয় পেয়ো না, সবর কর। আল্লাহ্‌র সাহায্য অবশ্যই আসবে কিন্তু তোমাদেরকে ঈমানের মজবুত ভিত্তির ওপর গড়ে তোলার জন্য অবশ্যই পরীক্ষার একটি সময় কাল অতিবাহিত হওয়া প্রয়োজন। এ পরীক্ষায় ঈমানদারকে পাস করতে হবে। ঐ সব কাহিনীর মাধ্যমে মক্কার কাফিরদেরকেও এ বলে সাবধান করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী নবীদের সাথে যারা দুশমনি করেছে তাদেরকে শেষ পর্যন্ত যেমন কঠিনভাবে পাকড়াও করা হয়েছে, তোমাদেরকেও যথাসময়ে ধরা

হবে। পাকড়াও করতে দেরি হচ্ছে বলে একথা মনে করার কোন সুযোগ নেই যে, তোমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে। অতঃপর মুসলমানদেরকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি জুলুম নির্যাতন সহ্য করতে না পার তাহলে ঈমান ত্যাগ না করে তোমাদের ঘর বাড়ী ত্যাগ করে হিজরাত করো। আল্লাহর যমীন অনেক প্রশস্ত। কাজেই যেখানে গিয়ে ঈমান নিয়ে শান্তিতে থাকা যাবে সেখানে চলে যাও। (তাফহীম)

অনুবাদ

আলিফ-লাম- মীম।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এগুলো হুরুফে মুকাত্তায়াত বা বিচ্ছিন্ন হরফ। এর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহই অবগত আছেন।

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوْا أَن يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ

অনুবাদ

মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি' শুধু এটুকু কথা বললেই ছেড়ে দেয়া হবে তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ঈমানদার ব্যক্তিদের ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্য অর্জনের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ওয়াদা রয়েছে তা অর্জন করে কোন ব্যক্তি নিছক মৌখিক ঈমানের দাবীর মাধ্যমে তার অধিকারী হতে পারে না; বরং প্রত্যেককেই তার দাবীর অনিবার্য পরীক্ষা অতিক্রম করতে হবে। পরকালে জান্নাত লাভ ও ইহকালে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে ধন্য হতে হলে তাদেরকে পরীক্ষায় পাস করতে হবে। মৌখিকভাবে আল্লাহর উপর ঈমান আনার কথা উচ্চারণ করলেই আল্লাহ তাআলা ঐ সকল নিয়ামত পরীক্ষা করা ছাড়া দান করবেন না। যেমন পরীক্ষা করা হবে ভয়-ভীতি এবং লোভ লালসা দিয়ে। তা ছাড়া মানুষের প্রত্যেকটি ভালবাসা ও পছন্দ আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ

করতে হবে এমন অনভিপ্রেত কার্য তার জন্য বরদাশ্‌ত করতে হবে যা মানুষ অপছন্দ করে। ইসলামী আন্দোলনের বাঁকে বাঁকে যত নির্যাতন নিপীড়ন দেখা দেবে তা সহ্য করতে হবে এবং বিপদ মুসিবত ও সংকটের মোকাবিলা করে প্রমাণ করতে হবে আল্লাহকে মানার দাবী সত্য।

মক্কায় কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলেই তার ওপর বিপদ আপদ ও জুলুম নিপীড়নের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। কোন গোলাম বা গরীব মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে ভীষণভাবে মারপিট এবং কঠোর নির্যাতন নিপীড়নের যাঁতাকলে নিস্পেষিত করা হতো। সে যদি কোন দোকানদার বা কারিগর হতো তাহলে তার রুজি রোজগারের পথ বন্ধ করে দেয়া হতো। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে অনাহারে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে হতো। সে যদি কোন প্রভাবশালী পরিব্মরের ব্যক্তি হত, তাহলে তার নিজের পরিবারের লোকেরা তাকে নানাভাবে বিরক্ত করতো ও কষ্ট দিতো এবং এভাবে তার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলতো। এ অবস্থা মক্কায় একটা মারাত্মক ভীতি ও আতংকের পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। এ কারণে লোকেরা নবী (স) এর সত্যতার স্বীকৃতি দেয়া সত্ত্বেও ঈমান আনতে ভয় করতো এবং কিছু লোক ঈমান আনার পর ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হলে সাহস ও হিম্মতহারা হয়ে কাফেরদের সামনে নতজানু হয়ে যেতো। এ পরিস্থিতি যদিও দৃঢ় ঈমানের অধিকারী সাহাবীগণের অবিচল নিষ্ঠার মধ্যে কোন প্রকার দোদুল্যমানতা সৃষ্টি করেনি তবুও মানবিক প্রকৃতির তাগিদে অধিকাংশ সময় তাদের মধ্যেও একটা মারাত্মক ধরনের চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে যেতো। এ ধরনের অবস্থার একটা চিত্র পেশ করে হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত বর্ণিত একটি হাদীস । হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন বুখারী, আবু দাউদ ও নাসাঈ তাদের গ্রন্থে। তিনি বলেন ঃ যে সময় আমরা মুশরিকদের কঠোর নির্যাতনে ভীষণ দুরাবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলাম সে সময় একদিন আমি দেখলাম নবী (স) কা'বা ঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে রয়েছেন। আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম হে আল্লাহর রাসূল। আপনি কি আমাদের জন্য দুআ করেন না, একথা শুনে তার চেহারা আবেগ উত্তেজনায় রক্তিমবর্ণ ধারন করলো এবং তিনি বললেনঃ "তোমাদের পূর্ব যেসব মুমিনদল অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এর চাইতেও বেশী নিগৃহীত হয়েছে। তাদের কাউকে মাটিতে গর্ত করে গর্তের

মধ্যে বসিয়ে দেয়া হতো এবং তারপর তার মাথার উপর করাত চালিয়ে দু'টুকরা করে দেয়া হতো। কারো অংগ প্রত্যংগের সন্ধিস্থলে লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়ানো হতো, যাতে তারা ঈমান প্রত্যাহার করে। আল্লাহর কসম; এ কাজ সম্পন্ন হবেই, এমন কি এক ব্যক্তি সানআ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত নিশংক চিত্তে সফর করবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় তার থাকবে না।

এ চিত্তচাঞ্চল্যকে অবিচল ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় রূপান্তরিত করার জন্য মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে বুঝান, ইহকালীন সাফল্য অর্জনের জন্য আমার যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি রয়েছে কোন ব্যক্তি নিছক মৌখিক ঈমানের দাবীর মাধ্যমে তার অধিকারী হতে পারবে না। বরং প্রত্যেক দাবীদারকে অনিবার্যভাবে পরীক্ষার চুল্লী অতিক্রম করতে হবেই। তাকে এভাবে নিজের দাবীর সত্যতার প্রমাণ পেশ করতে হবে। আমার জান্নাত এত সস্তা নয় এবং দুনিয়াতেও আমার বিশেষ অনুগ্রহ এত আয়াসলব্ধ নয় যে, তোমরা কেবলই মুখে আমার প্রতি ঈমান আনার কথা উচ্চারণ করবে আর অমনিই আমি তোমাদেরকে সেসব কিছুই দান করে দেবো। এসবের জন্য তো পরীক্ষার শর্ত রয়েছে। আমার জন্য কষ্ট বরদাশত করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করতে হবে, বিপদ-মুসীবত ও সংকটের মোকাবিলা করতে হবে। ভীতি ও আশংকা দিয়েও পরীক্ষা করা হবে এবং লোভ লালসা দিয়েও। এমন প্রত্যেকটি জিনিস যা ভালোবাসো ও পছন্দ করো, আমার সন্তুষ্টির জন্য তাকে উৎসর্গ করতে হবে। আর এমন প্রত্যেকটি কষ্ট যা তোমাদের অনভিপ্রেত এবং তোমরা অপছন্দ করে থাকো, আমার জন্য তা অবশ্যই বরদাশত করতে হবে। তারপরেই তোমরা আমাকে মানার যে দাবী করেছিলে তার সত্য মিথ্যা যাচাই হবে। কুরআন মাজীদের এমন প্রত্যেকটি জায়গায় যেখানে বিপদ মুসীবত ও নিগ্রহ নিপীড়নের সর্বব্যাপী আক্রমনে মুসলমানদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের অবস্থা হয়ে গেছে সেখানেই একথা বলা হয়েছে। হিজরাতের পরে মদীনায় মুসলমানদের জীবনের প্রথমাবস্থায় যখন অর্থনৈতিক সংকট, বাইরের বিপদ এবং ইহুদী ও মুনাফিকদের ভিতরের দুস্কৃতি মুমিনদেরকে ভীষণভাবে পেরেশান করে রেখেছিল তখন আল্লাহ বলেনঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتَّى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ

"তোমরা কি মনে করেছো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ এখনো তোমরা সে অবস্থার সম্মুখীন হওনি, যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী (ঈমানদার) গণ? তারা সম্মুখীন হয়েছিল নির্মমতা ও দুঃখ ক্লেশের এবং তাদেরকে অস্থির করে তোলা হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা চিৎকার করে বলে উঠেছিল আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? (তখনই তাদেরকে সুখবর দেয়া হয়েছিল এই মর্মে যে) জেনে রেখো, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই। (সূরা আল-বাকারা, ২১৪)

অনুরূপভাবে ওহুদ যুদ্ধের পর যখন মুসলমানদের উপর আবার বিপদ-মুসীবতের একটি দুর্যোগপূর্ণ যুগের অবতারণা হয়। তখন বলা হয়।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ

"তোমরা কি মনে করে নিয়েছো, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে অথচ এখনো আল্লাহ দেখেনইনি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে জিহাদে প্রাণ উৎসর্গকারী এবং কে সবরকারী। (আলে ইমরান ঃ ১৪২)

আর পরীক্ষাই হচ্ছে এমন একটি মানদণ্ড যার মাধ্যমে ভেজাল ও নির্ভেজাল যাচাই করা যায় (তাফহীম)

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হয় মুমিনদের উপর তারপর সৎলোকদের ওপর, তারপর তাদের চেয়ে নিম্ন মর্যাদার লোকদের ওপর, তার পর তাদের চেয়েও নিম্ন মর্যাদার লোকদের ওপর। পরীক্ষা তাদের দীনের অনুপাতে হয়ে থাকে। যদি সে তার দীনের ওপর দৃঢ় হয়

তবে তার পরীক্ষাও কঠিন হয় এবং বিপদ-আপদ তার ওপর অবতীর্ণ হয়ে থাকে। (ইবনে কাসীর ঃ ৫৫১)

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ

অনুবাদ

অথচ তাদের আগে যারা ছিল তাদের সবাইকে আমি পরীক্ষা করেছি আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে যে, ঈমানের দাবীতে কে সত্যবাদী- আর কে মিথ্যাবাদী।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

মক্কার কাফিরদের কর্তৃক মুসলমানগণের নিগৃহীত হওয়া ইসলামের ইতিহাসে নতুন কোন ব্যাপার নয়। ইতিহাসে হরহামেশা এমনটি হয়ে এসেছে। যে ব্যক্তিই ঈমানের দাবী করেছে তাকেই পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে দগ্ধ করা হয়েছে। অন্যদেরকেও যখন পরীক্ষা না করে কিছু দেয়া হয়নি তখন তোমাদের এমনকি বিশেষত্ব আছে যে, কেবলমাত্র মৌখিক দাবীর ভিত্তিতেই তোমাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে?

দীনদারের জন্য রাসূল (স) বলেছেন ঃ মানুষের উপর এমন যুগ আসবে যখন দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা জলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মতো কঠিন হবে। (তিরমিযী শরীফ)

আল্লাহ তায়ালা ইমানদার ব্যক্তিগণকে পরীক্ষায় ফেলেই কে সাচ্চা ঈমানদার তা পরীক্ষা করে দেখবেন। এবং তারই ভিত্তিতে তিনি প্রতিদান দেবেন। আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন তখন অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্যে তাদেরকে বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতপর যারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে খুশি মনে মেনে নেয় এবং ধৈর্য ধারণ করে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহর ওপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিযী)

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَّسْبِقُوْنَا سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ

অনুবাদ

যারা মন্দ কর্ম করে তারা কি এ ধারণা করে আছে যে, তারা আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে? তাদের ফয়সালা খুবই মন্দ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

বিপদ-মুসীবত ও জুলুম নিপীড়নের মোকাবেলায় মুসলমানদেরকে সবর ও দৃঢ়তা অবলম্বন করার নির্দেশ দেবার পর এ সত্য পন্থীদের ওপর যারা জুলুম নিপীড়ন চালিয়েছিল তাদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ হে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ। ওলীদ ইবনে মুগীরা আবু জেহেল, উতবাহ শাইবাহ উকবাহ ইবনে আবু মুআইত ও হানযালা ইবনে ওয়াইল তোমরা যারা ঈমানদারদের ওপর জুলুম নির্যাতন চালিয়েছো তারা ভুল সিদ্ধান্তে নিমজ্জিত। কারণ তারা সত্য পথের হিদায়েত থেকে দূরে অবস্থান করছে। কাজেই আমার রাসূলকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা সফল হবে না আর আমার পাকড়াও থেকে পালিয়ে আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে পারবে না। যারা ঈমান আনয়ন করেনি তারাও আমার পরীক্ষা হতে বেঁচে যেতে পারবে না।

مَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অনুবাদ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে তার জানা উচিত যে, আল্লাহর নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে। আর তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

যারা আশা রাখে এমন একটি সময় আসবে যখন তাদের রবের নিকট হাজির হয়ে প্রতিটি কাজের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দিতে হবে এবং নিজের কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি পেতে হবে। কাজেই এ ভুল ধারণায় ডুবে থাকা উচিত নয় যে, মৃত্যুর সময় অনেক দূরে; বরং এ ধারনা পোষণ করা উচিত যে, মৃত্যু যে কোন সময় এসে যাবে তখন আর ভাল কাজ করার সময় থাকবে না।

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দিবেন না। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা অবগত আছেন। (সূরা আল-মুনাফিক ঃ ১১)

আর যারা পরকালীন জীবনে বিশ্বাস করে না এবং কারো সামনে নিজের কাজের জবাবদিহী করতে হবে বলে মনে করে না তাদের কথা আলাদা।

তবে একথা ঠিক যে তাদেরকে এমন এক মহান সত্তার সামনে জবাবদিহী করতে হবে যে তিনি সব কিছু জানেন ও শোনেন। তাঁর কাছে তাদের কোন বিষয়ই গোপন নেই।

কাজেই যাদের আখিরাতে বিনিময় লাভের আশা রয়েছে এবং ওটাকে সামনে রেখে নেক কাজ করে থাকে তাদের আশা অবশ্যই পূর্ণ হবে। তারা এমন পুরস্কার লাভ করবে যা কখনো শেষ হবার নয়। আল্লাহ তাআলা শ্রবণকারী। তিনি জগত সমূহের সব খবর রাখেন। তাঁর নির্ধারিত সময় টলবার নয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ

অনুবাদ

যে চেষ্টা সাধনা করবে সে তো নিজের ভালোর জন্যই করবে। নিশ্চয়ই গোটা সৃষ্টি জগতের কারো কাছে আল্লাহর কোনো ঠেকা নেই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

যে কেউ ভাল আমল করে সে তার নিজের লাভের জন্যই তা করে। আল্লাহ তাআলা মানুষের আমলের জন্য মুখাপেক্ষী নন। যদি সমস্ত মানুষ আল্লাহ ভীরু হয়ে যায় তবুও তার সাম্রাজ্য সামান্য পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে না। (ইবনে কাসীর ঃ ৫৫৩)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা جهد শব্দ ব্যবহার করেছেন যা "মুজাহাদা" থেকে লওয়া হয়েছে। আর "মুজাহাদা" শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে, কোন বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম, প্রচেষ্টা ও সাধনা করা। আর যখন কোন বিশেষ বিরোধী শক্তি চিহ্নিত করা হয় না বরং সাধারণভাবে

"মুজাহাদা" শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় একটি সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী দ্বন্দ্ব-সংঘাত। মুমিনকে এ দুনিয়ায় যে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম করতে হয় তা হচ্ছে এ ধরনের। তাকে শয়তানের সাথেও লড়াই করতে হয় যে তাকে সর্বাত্মক সৎকাজের ক্ষতির ভয় দেখায় এবং অসৎকাজের লাভ ও স্বাদ উপভোগের লোভ দেখিয়ে বেড়ায়। তাকে নিজের নফসের বা কুপ্রবৃত্তির সাথেও লড়তে হয়, যা তাকে সর্বক্ষণ নিজের খারাপ ইচ্ছা-আকাঙ্খার দাসে পরিণত করে রাখার জন্য চাপ দিতে থাকে নিজের গৃহ থেকে নিয়ে বিশ্ব-সংসারের এমন সকল মানুষের সাথে তাকে লড়তে হয় যাদের আদর্শ, মতবাদ, মানসিক প্রবণতা, চারিত্রিক নীতি, রসম-রেওয়াজ, সাংস্কৃতিক ধারা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধান সত্য দীনের সাথে সংঘর্ষশীল। তাকে এমন রাষ্ট্রের সাথেও লড়তে হয় যে, আল্লাহর আনুগত্যমুক্ত থেকে নিজের ফরমান জারী করে এবং সততার পরিবর্তে অসততাকে বিকশিত করার জন্য শক্তি নিয়োগ করে। এ প্রচেষ্টা সংগ্রাম এক-দু'দিনের নয়, সারাজীবনের। দিন রাতের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে প্রতি মূহুর্তের কোন একটি ময়দানে নয় বরং জীবনের প্রত্যকটি ময়দানে ও প্রতি দিকে। এ সম্পর্কেই হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ

اِنَّ الرَّجُلَ لَيُجَاهِدُ وَمَا ضَرَبَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ بِسَيْفٍ

"মানুষ যুদ্ধ করে চলে, যদিও কখনো একবারও তাকে তলোয়ার চালাতে হয় না। (ইবনে কাছীর ঃ ৫৫৩)

وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অনুবাদ

যারা ঈমান এনেছে নেক আমল করেছে আমি তাদের সব দোষ তাদের থেকে দূর করে দিব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেবো।

আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি নিশ্চয়ই তাদের মন্দ কর্মগুলো মিটিয়ে দিবো এবং তাদের কাজের উত্তম ফল দান করবো।

ঈমান অর্থ এমন সব জিনিসকে আন্তরিককভাবে মেনে নেয়া, যেগুলো মেনে নেবার জন্য আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তার কিতাব দাওয়াত দিয়েছে। আর সৎকাজ হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা। মানুষের চিন্তাধারা, ধারণা কল্পনা ও ইচ্ছার পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাই হচ্ছে মন ও মস্তিষ্কের সৎকাজ। খারাপ কথা না বলা এবং হক-ইনসাফ ও সত্য-সততা অনুযায়ী সব কথা বলাই হচ্ছে কণ্ঠের সৎকাজ। আর মানুষের সমগ্র জীবন আল্লাহর জীব আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগীর মধ্যে এবং তাঁর বিধানসমূহ মেনে চলে অতিবাহিত করাই হচ্ছে অংগ-প্রত্যংগে ও ইন্দ্রিয়ের সৎকাজ। এ ঈমান ও সৎকাজের দু'টি ফল বর্ণনা করা হয়েছে।

এক. মানুষের দুষ্কৃতি ও পাপগুলো তার থেকে দূর করে দেয়া হবে।
দুই. তার সর্বোত্তম কাজসমূহের সর্বোত্তম পুরস্কার তাকে দেওয়া হবে।

পাপ ও দুষ্কৃতির কয়েকটি অর্থ হয়। একটি অর্থ হচ্ছে ঈমান আনার আগে মানুষ যতই পাপ করে থাকুক না কেন ঈমান আনার সাথে সাথেই তা সব মাফ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, ঈমান আনার পর মানুষ বিদ্রোহ প্রবণতা সহকারে নয় বরং মানবিক দুর্বলতা বশত যেসব ভুল-ত্রুটি করে থাকে, তার সৎকাজের প্রতি নজর রেখে সেগুলো উপেক্ষা করা হবে। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, ঈমান ও সৎকর্মশীলতার জীবন অবলম্বন করার কারণে আপনা আপনিই মানুষের নফসের সংশোধন হয়ে যাবে এবং তার অনেকগুলো দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে।

ঈমান ও সৎকাজের প্রতিদান সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ

لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

এর দুটি অর্থ হয়। একটি হচ্ছে ঃ মানুষের সৎকাজগুলোর মধ্যে যেটি হবে সবচেয়ে ভালো সৎকাজ, তাকে সমানে রেখে তার জন্য প্রতিদান ও পুরস্কার নির্ধারণ করা হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মানুষ তার কার্যাবলীর দৃষ্টিতে যতটা

পুরস্কারের অধিকারী হবে তার চেয়ে বেশি ভালো পুরস্কার তাকে দেয়া হবে। একথাটি কুরআনের অন্যান্য স্থানেও বলা হয়েছে। যেমন সূরা আন'আমে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে তাকে তার থেকে দশগুণ বেশী দেয়া হবে। (সূরা আন'আম ঃ ১৬০)

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا

যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে তাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে। (সূরা আল কাসাস ঃ ৮৪)

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا

"আল্লাহ তো কণামাত্রও জুলুম করে না এবং সৎকাজ হলে তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন।" (সূরা আন নিসা ঃ ৪০)

শিক্ষা

১. ঈমানের দাবীদার ব্যক্তিদের-কে পরীক্ষা করা হবে।
২. কেহই আল্লাহর আয়ত্বের বাইরে চলে যেতে পারবে না।
৩. আল্লাহর নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে।
৪. যে চেষ্টা-সাধনা করবে তা নিজেরই কাজে আসবে।
৫. যারা ঈমান এনে সৎকর্ম করবে তাদের গুনাহ মাফ করে উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে।

৬

মুত্তাকীদের সাদর সম্ভাষণ

৩৯. সূরা আয-যুমার

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত–৭৫, রুকূ–৮

আলোচ্য আয়াত ঃ ৭১-৭৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(٧١) وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلٰى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتّٰى إِذَا جَاؤُوْهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ (٧٢) قِيْلَ ادْخُلُوْا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ (٧٣) وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتّٰى إِذَا جَاؤُوْهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ (٧٤) وَقَالُوْا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيْنَ (٧٥) وَتَرَى الْمَلاَئِكَةَ حَافِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (৭১) কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাকিয়ে নেয়া হবে যখন তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন উহার দরজা সমূহ খোলা হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে কোন রাসূল আসেননি? যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহ আবৃত্তি করতেন এবং এ বিষয় সাবধান করে দিয়েছেন যে, একদিন তোমাদেরকে এ দিনটির সম্মুখীন হতে হবে। তারা বলবে হাঁ অবশ্যই এসেছিলেন কিন্তু আযাবের সিদ্ধান্ত কাফেরদের জন্য অবধারিত হয়ে গিয়েছে। (৭২) তাদেরকে বলা হবে জাহান্নামের দরজার দিয়ে প্রবেশ করো। তোমাদেরকে চিরকাল এখানেই থাকতে হবে। অহংকারীদের জন্য এটাই অত্যন্ত জঘণ্য আবাসস্থল। (৭৩) আর মুত্তাকীদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে তখন দেখবে তার দরজা সমূহ পূর্বেই খুলে দেয়া হয়েছে। এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে তোমাদের প্রতি সালাম তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে চিরকালের জন্য প্রবেশ কর। (৭৪) আর তারা বলবে সেই মহান আল্লাহর শুকরিয়া যিনি আমাদের সাথে কৃত তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করলেন এবং আমাদেরকে এ যমীনের উত্তারাধিকারী করে দিয়েছেন। এখন আমরা জান্নাতের যেথায় ইচ্ছা (সেথায়) বসবাস করতে পারবো। (৭৫) আরো তুমি দেখতে পাবে যে, ফেরেশতারা আরশের চারিদিকে ঘিরে তাদের রবের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে। মানুষের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করে দেয়া হবে ঘোষণা দেয়া হবে। সারা বিশ্ব জাহানের রবের জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

শব্দার্থ ঃ وَ ঃ এবং। سِيْقَ ঃ তাড়িয়ে নেওয়া হবে। الَّذِيْنَ ঃ (তাদেরকে) যারা। كَفَرُوْا ঃ কুফরী করেছে। إِلَىٰ ঃ দিকে। جَهَنَّمَ ঃ জাহান্নামের। زُمَرًا ঃ দলে দলে। حَتّٰى ঃ শেষ পর্যন্ত। إِذَا ঃ যখন। جَاؤُوْهَا ঃ তার (কাছে) পৌছবে। فُتِحَتْ ঃ খুলে দেওয়া হবে। أَبْوَابُهَا ঃ তার দরজাগুলো। وَ ঃ এবং। قَالَ ঃ বলবে। لَهُمْ ঃ তাদেরকে। خَزَنَتُهَا ঃ তার রক্ষীরা। أَلَمْ يَأْتِكُمْ

ঃ তোমাদের কাছে আসে নাই কি? رُسُلٌ ঃ রাসূলগণ। مِّنْكُمْ ঃ তোমাদের মধ্য হতে। يَتْلُوْنَ ঃ তারা আবৃত্তি করে শুনাত। عَلَيْكُمْ ঃ তোমাদের কাছে। اٰيٰتِ ঃ আয়াসমূহ। رَبِّكُمْ ঃ তোমার রবের। وَ ঃ ও। يُنْذِرُوْنَكُمْ ঃ তোমাদেরকে সতর্ক করত। لِقَاءَ ঃ সাক্ষাতের। يَوْمِكُمْ তোমাদের দিনের। هٰذَا ঃ এই। قَالُوْا ঃ তার বলবে। بَلٰى ঃ হা (এসেছিল)। وَلٰكِنْ ঃ কিন্তু। حَقَّتْ ঃ অবধারিত হয়েছিল। كَلِمَةُ ঃ বাণী। الْعَذَابِ ঃ শাস্তির। عَلٰى ঃ উপর। الْكَافِرِيْنَ ঃ কাফেরদের। قِيْلَ ঃ বলা হবে। ادْخُلُوْا ঃ তোমরা প্রবেশ কর।। أَبْوَابَ ঃ দরজাসমূহে। جَهَنَّمَ ঃ জাহান্নামের। خَالِدِيْنَ ঃ চিরস্থায়ী হবে। فِيْهَا ঃ তার মধ্যে। فَبِئْسَ ঃ অতঃপর কত নিকৃষ্ট। مَثْوٰى ঃ আবাসস্থল। الْمُتَكَبِّرِيْنَ ঃ অহংকারীদের। وَ ঃ এবং। سِيْقَ ঃ নিয়ে যাওয়া হবে। الَّذِيْنَ ঃ যারা। اتَّقَوْا ঃ নাফরমানি হতে বিরত ছিল। رَبَّهُمْ ঃ তাদের রবের। إِلٰى ঃ দিকে الْجَنَّةِ ঃ জান্নাতের। زُمَرًا ঃ দলে দলে। حَتّٰى ঃ শেষ পর্যন্ত। إِذَا ঃ যখন। جَاءُوْهَا ঃ তার (কাছে) পৌছিবে। وَ ঃ এবং। فُتِحَتْ ঃ খুলে দেয়া হবে। أَبْوَابُهَا ঃ তার দরজাসমূহ। وَ ঃ এবং। قَالَ ঃ বলবে। لَهُمْ ঃ তাদেরকে। خَزَنَتُهَا ঃ তার রক্ষীরা। سَلَامٌ ঃ সালাম। عَلَيْكُمْ ঃ তোমাদের উপর। طِبْتُمْ ঃ তোমরা সুখী হও। فَادْخُلُوْ ঃ তোমরা অতঃপর প্রবেশ কর। هَا ঃ তাতে। خَالِدِيْنَ ঃ তোমরা স্থায়ী হবে (সেখানে)। وَ ঃ

এবং । قَالُوْا ঃ তারা বলবে । اَلْحَمْدُ ঃ সমস্ত প্রশংসা (ও শোকর) لِلّٰهِ ঃ আল্লাহর জন্যে । الَّذِيْ ঃ যিনি । صَدَقَنَا ঃ আমাদেরকে সত্য করে দেখিয়েছেন । وَعْدَهٗ ঃ তার প্রতিশ্রুতি । وَ ঃ এবং । أَوْرَثَنَا ঃ আমাদেরকে ওয়ারিস করেছেন । الْأَرْضَ ঃ যমীনের । نَتَبَوَّأُ ঃ স্থান বানিয়ে নেব আমরা । مِنَ মধ্য হতে الْجَنَّةِ ঃ জান্নাতের । حَيْثُ যেখানে نَشَاءُ ঃ ইচ্ছা করব আমরা । فَنِعْمَ ঃ অতএব কত উত্তম أَجْرُ ঃ পুরস্কার الْعَامِلِيْنَ ঃ (নেক) কর্ম সম্পাদনকারীদের । وَ ঃ আর । تَرَى ঃ দেখবে তুমি الْمَلٰئِكَةَ ঃ ফেরেশতাদেরকে حَافِّيْنَ ঃ ঘিরে থাকবে । مِنْ حَوْلِ ঃ চতুষ্পার্শে الْعَرْشِ ঃ আরশের । يُسَبِّحُوْنَ ঃ তারা মহিমা ঘোষণা করতে থাকবে । بِحَمْدِ ঃ প্রশংসাসহ । رَبِّهِمْ ঃ তাদের রবের । وَ ঃ এবং قُضِيَ ঃ বিচার করে দেওয়া হবে । بَيْنَهُم ঃ তাদের মাঝে । بِالْحَقِّ ঃ ন্যায়ভাবে । وَ ঃ এবং । قِيْلَ ঃ বলা হবে । اَلْحَمْدُ ঃ সকল প্রশংসা । لِلّٰهِ ঃ আল্লাহর জন্য । رَبِّ (যিনি) রব । الْعَالَمِيْنَ ঃ জগতসমূহের ।

সূরার নামকরণ ঃ সূরার নাম যুমার । আয়াত নম্বর ৭১ ও ৭৩ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلٰى جَهَنَّمَ زُمَراً এবং وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا থেকে সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে । এর অর্থ এটি সে সূরা যার মধ্যে 'যুমার' শব্দের উল্লেখ আছে ।

নাযিল হওয়ার সময় কাল

এ সূরা যে হাবশায় হিজরত করার পুর্বে নাযিল হয়েছিল, সে ব্যাপারে ১০ নম্বর আয়াত وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ থেকে স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায়। কোন কোন রেওয়ায়েতে একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত জাফর ইবনে আবী তালেব ও তার সংগী সাথীগণ হাবশায় হিজরতের সংকল্প করলে তার সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। (রুহুল মায়ানী, ২৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ২২৬)

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

হাবশায় হিজরতের কিছু পূর্বে মক্কার পরিবেশ ছিল জুলুম-নির্যাতন এবং শত্রুতা ও বিরোধিতায় ভরা। ঠিক এ পরিবেশে এ গোটা সূরাটিকে একটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতারূপে পেশকরা হয়েছে। এটা একটা নসীহত। এতে মাঝে মধ্যে ঈমানদারদের সম্বোধন করা হলেও বেশীরভাগ কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের সম্বোধন করা হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মদ (স) এর দাওয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, মানুষ যেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করে এবং তার আল্লাহ প্রীতিকে অন্য কারো দাসত্ব ও আনুগত্য দ্বারা কলুষিত না করে। এ মৌলিক নীতিকে বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে উপস্থাপন করে অত্যন্ত জোরালো পন্থায় তাওহীদের সত্যতা এবং তা মেনে চলার উত্তম ফলাফল আর শিরকের ভ্রান্তি ও তা আঁকড়ে ধরে থাকার মন্দ ফলাফল অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া মানুষকে ভ্রান্ত আচরণ পরিত্যাগ করে আল্লাহর রহমতের দিকে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ঈমানদারদেরকে পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, যদি আল্লাহর দাসত্বের জন্য একটি জায়গা সংকীর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাঁর এ পৃথিবী অনেক প্রশস্ত। নিজের দীনকে রক্ষা করার জন্য অন্য কোথাও চলে যাও। আল্লাহ তোমাদের ধৈর্যের পুরস্কার দান করবেন। অন্যদিকে নবী (সা) কে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন একদিন না একদিন তোমাদেরকে এ পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে, এমন দুরাশা কাফেরদের মন থেকে দূর করে দাও এবং পরিস্কার ভাবে বলে দাও যে,

আমার পথ রোধ করার জন্য তোমরা যা কিছু করতে চাও করো, আমি আমার কাজ চালিয়ে যেতে থাকবো।

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُوْهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ

অনুবাদ

কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাকিয়ে নেয়া হবে যখন তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন উহার দরজা সমূহ খোলা হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে কোন রাসূল আসেননি? যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহ আবৃত্তি করতেন এবং এ বিষয় সাবধান করে দিতেন যে, একদিন তোমাদেরকে এ দিনটির সম্মুখীন হতে হবে। তারা বলতে "হাঁ অবশ্যই এসেছিলেন; কিন্তু আমরা তাদের দাওয়াত গ্রহণ করি নাই, আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান গ্রহণ করি নাই। তাই আযাবের সিদ্ধান্ত কাফেরদের জন্য অবধারিত হয়ে গিয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লাহ তাআলা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী হতভাগ্য কাফিরদের পরিণাম সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তাদেরকে জন্তুর মত শাসন-গর্জন ও ধমকের সাথে লাঞ্ছিত অবস্থায় দলে দলে হাকিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন ঃ

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ إِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا

অর্থাৎ " যেই দিন তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে" (৫২ ঃ১৩)

অর্থাৎ তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তারা হবে কঠিন পিপাসার্ত। যেমন মহান আল্লাহ্ আরো এক জায়গায় বলেন ঃ

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْداً وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْداً

অর্থাৎ যেদিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদেরকে সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করবো, এবং অপরাধীদেরকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে খেদিয়ে নিয়ে যাবো। (১৯ ঃ৮৫-৮৬) তাছাড়া তারা সেদিন হবে বধির, মূক ও অন্ধ এবং তাদেরকে মুখের ভরে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যেমন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তাআলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّاً

مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْراً

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করবো তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ, মূক ও বধির করে। তাদের আবাস্থল জাহান্নাম; যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করে দিবো। (১৭ ঃ ৯৭)

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ যখন তারা জাহান্নামের নিকটবর্তী হবে তখন ওর প্রবেশদ্বারগুলো খুলে দেয়া হবে, যাতে তৎক্ষণাৎ শাস্তি শুরু হয়ে যায়। অতঃপর তাদেরকে তথাকার রক্ষী ফেরেশতারা লজ্জিত করার জন্যে ধমকের সুরে বলবে ঃ তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেননি যাঁরা তোমাদের নিকট প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করতেন এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদেরেকে সতর্ক করতেন? তারা জবাবে বলবে ঃ হ্যাঁ, আমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল অবশ্যই এসেছিলেন, দলীলও কায়েম করেছিলেন, বহু কিছু আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন, বুঝিয়েছিলেন এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্কও করেছিলেন। কিন্তু আমরা তাদের কথায় কর্ণপাত করিনি, বরং তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলাম। কেননা, আমরা হলাম হতভাগ্য। আমাদের ভাগ্যে এই বিড়ম্বনাই ছিল। বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে।

জাহান্নাম

জাহান্নাম جهنم শব্দের অর্থ অত্যাধিক গভীরতা, জাহান্নাম শব্দটি জিহিন্নাম হতে এসেছে। ফার্সিতে জাহান্নামকে দোযখ বলা হয়। الجوهري এর মতানুযায়ী জাহান্নাম দোযখের বিভিন্ন নামের মধ্যে হতে একটি নাম। হিব্রু ভাষায় জাহান্নাম অর্থে কিহিন্নাম (كهنام) শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইবনে খালাওয়ায়হ জাহান্নাম শব্দটি আরবী শব্দ বলে নির্দেশ করেছেন। কোন কোন প্রাচ্যবিদ বলেন, জাহান্নাম বায়তুল মোকাদ্দাসের নিকট অবস্থিত একটি কূপের নাম যা হাইনুম উপত্যকায় অবস্থিত। উক্ত কূপে প্রাচীনকালে কানআনীয দেবতা মোলক এর নামে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে কুরবানী করা হত। এর আরবী প্রতিশব্দ নার (نار) অর্থ নরক জায়গা, দুঃখময় স্থান, জাহান্নাম ও নার উভয় শব্দের অর্থ আগুন তথা নরকাগ্নি।

প্রচলিত অর্থে শেষ বিচার দিবসে যারা পাপী, অপরাধী নাফরমান বলে সাব্যস্ত হবে এবং যাদের গুনাহর পাল্লা ভারী হবে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য চির দুঃখময় শাস্তির জায়গায় নিক্ষেপ করা হবে তাকেই জাহান্নাম বা দোযখ বা নরক বলা হয়। যারা কাফের ও মুশরেক তারা অনন্তকালের জন্যই জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। যাদের হৃদয়ে অনুপরিমাণ ঈমান রয়েছে বলে প্রমাণিত হবে, তারা পাপানুযায়ী শাস্তি ভোগ করার পর দোযখ হতে মুক্তি পেয়ে বেহেশতে যাওয়ার অনুমতি পাবে।

জাহান্নামের পরিবেশ

জাহান্নামের পরিবেশ অত্যন্ত নাজুক, ভয়াবহ বিভিষীকাময় ও লোমহর্ষক যাহার বর্ণনা শোনা মাত্র প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তির গা শিউরে উঠে। ভয়ে লোমকূপ গুলো খাড়া হয়ে যায়। এ পরিবেশ অভাবনীয় ও অকল্পনীয়। বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণিত আছে। نَارُكُمْ هٰذِهٖ اِحْدٰى وَسَبْعُوْنَ

جُزْءٌ بَيْنَ مِنْ نَّارِ جَهَنَّمَ দোযখের আগুন পৃথিবীর আগুন অপেক্ষা ৭০ গুণ অধিক তাপ যুক্ত। রাসূল (স) আরো বলেছেন ঃ দোযখের অগ্নির এক বিন্দু যদি সুর্যোদয়ের স্থানে স্থাপন করা হয়। তার উত্তাপে দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। দোযখের স্তর গুলো যত নিচে যাবে শাস্তির মাত্রা ততই অধিক হবে। প্রত্যেক স্তরের আযাব বিভিন্নরূপ হবে। দোযখের মধ্যে গাই নামক একটি স্থান আছে যার ধরপাকড়ে দোযখের অন্যান্য স্থান সমূহ প্রত্যহ এর আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে। দোযখে 'যামহারীর নামে আরেকটি স্থান আছে সেখানে অধিক শীত থাকবে। দোযখে আরো একটি স্থান আছে ' জুব্বুল হুজন' নামে একটি ভয়ঙ্কর স্থান। রাসূল (স) বলেন ঃ "তোমরা জুব্বুল হুজন থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। উহা দোযখের মধ্যকার একটি উপত্যকা, জাহান্নাম প্রত্যহ চারশত বার এর আযাব হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায়। দোযখের মধ্যে বিষ, পুঁজ, কর্দমের একটি কূপ আছে, তার নাম 'ত্বীনাতুল খাবাল' সেই কুপটির নিকটে ৭০ বছরের রাস্তা পরিমাণ উঁচু 'সাউদ' নামে একটি পাহাড় আছে কাফিরদেরকে তার চূড়া হতে দোযখের তলদেশে নিক্ষেপ করা হবে। দোযখে 'আরো একটি আবে হামীম নামে পুস্করিনী আছে। এর পানি এত গরম যে, তা দেখা মাত্রই গরমের তেজে মুখ, ঠোঁট নাভি পর্যন্ত নামবে, পাকস্থলী জ্বলে ভস্ম হয়ে যাবে। তথায় 'গাসসাক' নামক একটি পুস্করিনী আছে কাফিরদের ঘাম, পুঁজ, রক্ত তাতে জমা হবে। দোযখীরা তথায় কাতর হয়ে পানি চাইলে তা দেওয়া হবে। 'গিললীন" নামক ঝর্ণাতে তাদের মলমুত্র জমা হবে পাপীরা তাহতে খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করবে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ وَلاَ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ غِسْلِيْنَ তারা তথায় গিস্‌লীন নামক খাবার ব্যতীত অন্য কোন খাবার পাবে না। (সূরা হাক্কাহ ঃ ৩৬)

لاَ يَمُوْتُ فِيْهَا وَلاَ يَحْيِ لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ জাহান্নামে মৃত্যু আসবে না এবং জাহান্নামীদের শাস্তি সামান্যও লাঘব করা হবে না তারা

কারো পক্ষ হতে সাহায্য ও পাবে না। তারা সেখানে মরবেও না বাঁচবেও না। (সূরা ত্বহা ঃ ৭৪)

لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَهُمْ يُنْصَرُوْنَ তাদের থেকে আযাবের কিছু মাত্রও লাঘব করা হবে না। জাহান্নামীরা ধৈর্যধারণ করলেও শাস্তি হতে অব্যাহতি পাবে না এবং তাদেরকে কোন রকম সাহায্যও করা হবে না। (সূরা আল বাকারা ঃ ৮৬)

اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ (আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচারণকারী) গুনাহগার লোকেরা অনন্তকাল ধরে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। (সূরা যুখরুফ ঃ ৭৪)

জাহান্নামের স্তর সমুহ ঃ জাহান্নাম মোট সাতটি। পাপীদের শাস্তির ব্যবস্থা স্বরূপ আল্লাহ তাআলা সাতটি স্তরে জাহান্নামকে সাজিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ

শয়তান ও তার অনুসারীদের জন্য জাহান্নাম হল প্রতিশ্রুত স্থান। জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে। প্রত্যেক স্তরের জন্য বিভিন্ন ধরনের অধিবাসী নির্দিষ্ট রয়েছে। (সূরা আল-হিজর ঃ ৪৫)

স্তর অনুযায়ী জাহান্নামের সাতটি নাম হচ্ছে। যথাক্রমে ঃ

(১) জাহান্নাম (২) হাবিয়াহ (৩) জাহীম (৪) সাক্বার (৫) সায়ীর (৬) হুতামাহ (৭) লাযা

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتّٰى إِذَا جَاؤُوْهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ

অনুবাদ

আর মুত্তাকিদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে তখন দেখবে তার দরজা সমূহ পূর্বেই খুলে দেয়া হয়েছে। এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে তোমাদের প্রতি সালাম তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে চিরকালের জন্য প্রবেশ কর।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

উপরে হতভাগ্য ও পাপীদের পরিণাম ও তাদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখানে ভাগ্যবান আল্লাহভীরু ও সৎ লোকদের পরিণামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে উত্তম ও সুন্দর উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করিয়ে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের বিভিন্ন দল থাকবে। প্রথমে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বিশিষ্ট লোকদের দল, তারপর পূণ্যবানদের দল, এরপর তাদের চেয়েকম মর্যাদাপূর্ণ লোকদেরদল এবং এপর তাদের চেয়েও কম মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের দল থাকবে। নবীগণ থাকবেন নবীদের দলে, সিদ্দীকগণ থাকবেন তাদের সমপর্যায়ের লোকদের দলে, শহীদগণ থাকবেন শহীদদের দলে এবং আলেমগণ থাকবেন আলেমদের দলে। মোটকথা, প্রত্যেকেই তাঁর সমপর্যায়ের লোকের সাথে থাকবেন। যখন তাঁরা জান্নাতের নিকট পৌঁছে যাবেন এবং পুলসিরাত অতিক্রম করে ফেলবেন তখন তথায় একটি পুলের উপর তাঁদেরকে দাঁড় করানো হবে এবং তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যে যুলুম ও উৎপীড়ন ছিল তার প্রতিশোধ ও বদলা গ্রহণ করিয়ে দেয়া হবে। যখন তাঁরা সম্পূর্ণরূপে পাক-সাফ হয়ে যাবেন তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দান করা হবে।

মহান আল্লাহ বলেন যে, জান্নাতীরা যখন জান্নাতের নিকটবর্তী হবে তখন তার রক্ষক ফেরেশতারা তাদেরকে বলবে ঃ " তোমাদের প্রতি সালাম তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য। তোমাদের আমল, কথাবার্তা, চেষ্টা-তদবীর এবং বদলা-বিনিময় ইত্যাদি সবই আনন্দদায়ক।" যেমন রাসূলুল্লাহ (স) কোন এক যুদ্ধের সময় স্বীয় ঘোষককে বলেছিলেন ঃ "যাও, ঘোষণা করে দাও যে, জান্নাতের শুধু মুসলমানরাই যাবে কিংবা বলেছিলেন, মুমিনরাই শুধু জান্নাতে যাবে।"

ফেরেশতারা জান্নাতীদেরকে আরো বলবেন ঃ "তোমাদেরকে এ জান্নাত হতে কখনো বের করা হবে না। বরং তোমরা এখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।" জান্নাতীরা নিজেদের এই অবস্থা দেখে খুশি হয়ে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং বলবে ঃ "প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন।" দুনিয়ায় তাদের এই প্রার্থনাই ছিল ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার রাসূলদের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমাদেরকে প্রদান করুন এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে হেয় করবেননা। আপনি তো প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৪)

জান্নাত

جَنَّةٌ আরবী শব্দ। ইহা এক বচন তার বহুচন হলো جَنَّاتٌ বা جِنَانٌ যার অর্থ বাগান। ফারসী ভাষায় যাকে বলে বেহেশত।

জান্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ উদ্যান বাগান, সুখময় স্থান ইত্যাদি। আর পরিভাষায় পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনের অবসানের পর মুমিনদের অনন্ত সুখময়, চিরস্থায়ী জীবনের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সুসজ্জিত আবাস প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাকে জান্নাত বা বেহেশত বলে।

জান্নাতের পরিবেশ

বেহেশত চিরশান্তিময় স্থান। সেখানে রোগ-শোক, জ্বরা মৃত্যু ও বার্ধক্য থাকবে না। বেহেশতের ভিত্তি স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। এর ভূমি মিশকের ন্যায়, বালি কর্পুরের ন্যায় এবং তরুলতা জাফরানের ন্যায় সুগন্ধিপূর্ণ, সুশোভিত, সুমোহিত, সুসজ্জিত এর ঝর্ণা ধারাগুলো সুগন্ধে পরিপূর্ণ। এতে দুগ্ধ, মধু, পবিত্র শরাব এবং স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা ও স্রোতস্বিনীসমূহ সদা প্রবাহমান। এতে নানা রকম সুস্বাদু ফলের সুশোভিত রাগ বাগিচা রয়েছে।

বাগানের তলদেশ দিয়ে সদা প্রবাহমান ঝর্ণাধারা অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে আছে। বেহেশতের প্রাসাদসমূহ মনি-মুক্তা, ইয়াকুত ও জমরুদ পাথরের তৈরী। তার শয্যা ও আসনসমূহ মনি-মুক্তা খচিত। প্রাসাদ সমূহের মধ্যে এমন মনোরম ও মনোহরিণী নয়ন বিশিষ্ট পরমা সুন্দরী হুরগণ রয়েছে যাদেরকে কখনো কোন মনুষ্য বা জ্বীন স্পর্শ করেনি। মুক্তার ন্যায় চিরকিশোর গিলমানগণ তাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পানি পরিবেশন করবে। প্রত্যেক বেহেশতীর জন্য দুটি স্বর্ণের ও দুটো রৌপ্যের বাগান থাকবে। পার্থিব জগতের ধার্মিকা স্ত্রী ও সন্তানগণ তাদের সঙ্গে থাকবে। নর-নারী প্রত্যেকেই চির যৌবনা হবে। কখনো বৃদ্ধ হবে না। তাদের মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হবে না। তাদের কোন কিছুরই অভাব থাকবে না। যা কিছু চাবে চাওয়া মাত্র উপস্থিত পাবে।

বেহেশতবাসী আপন আবাসে প্রবেশের পর তাদের মনে একটি বিষয় সহসা উকি মারবে যে, মৃত্যু এসে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ আনন্দ আহলাদ ধ্বংস করে দেয় কি না? তখন বেহেশতী এবং দোজখীদের আপন আলয়ের কিনারার দিকে আসার আহ্বান করা হবে। মাবুদের পক্ষ হতে আদশে প্রাপ্ত হয়ে তারা একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হলে তাদের সকলে মধ্যস্থলে দুম্বার আকৃতি বিশিষ্ট উটকে যবেহ করা হবে। অধিকাংশ আলেমের মতে হযরত ইয়াহইয়া (আ) সে দুম্বাটি যবেহ করবে। মৃত্যুর যবেহ কার্য সমাধা হওয়ার পর বেহেশতীদের লক্ষ্য করে ঘোষণা করা হবে। يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ اُدْخُلُوْهَا وَلَا مَوْتَ অর্থাৎ বেহেশবাসীগণ! তোমরা নিজ নিজ স্থানে প্রবেশ কর মৃত্যুর চির অবসান হয়ে গেল।

জান্নাতে শীতও নেই গরমও নেই বরং তথায় সদা বসন্ত বিরাজমান। আমাদের দুঃখপূর্ণ পৃথিবীতে বসন্ত ঋতু বেশ আরামদায়ক বলে তা ঋতুরাজ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে সুর্যের প্রচণ্ড তাপে মানুষ জ্বলে পুড়ে মরে তুষারাবৃত বরফঢাকা পাহাড় পর্বতমালার অত্যাধিক শীতের আক্রমণে মানুষ জর্জরিত হয়। কিন্তু চিরশান্তিময় বসন্তের সমারোহে ভরপুর জান্নাতে সুর্য ও হিমালয় পাহাড় পর্বতের নিশানাও নেই। কাজেই সেখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। তথায়

শুধু আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অনির্বচনীয় তাজাল্লী ও জ্যোতির আভায় জান্নাতীগণ মহানন্দে বিভোর হয়ে থাকবে। চির এয়ার কন্ডিশান জান্নাতের আবহাওয়া বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ لاَ يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّ لاَ زَمْهَرِيْرًا সেখানে তারা প্রখর সৌরতাপ কিংবা প্রবল শৈত্য দেখতে পাবেনা। (সূরা আদ-দাহার ঃ ১৩)

চির সুখের আবাস বেহেশতে এ দুনিয়ার ন্যায় নোংরা কোন বিষয় বস্তু থাকবে না। সেখানে ইজ্জত আব্রুর, জান-মালের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। থাকবে না কোন অশালীন আচরণ কথা বার্তা বেহায়াপনা বেলেল্লাপনা হত্যা, লুণ্ঠন, লুটতরাজ, খুনখারাবী, মারামারি হানাহানি, বিভেদ, ঝগড়া, নৈরাজ্যপনা, দুঃখ কষ্ট, রোগ, শোক, চিন্তা-ভাবনা বরং- সেখানে বিরাজ করবে অভাবনীয় পরিবেশ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ
اَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ তোমাদের কোন ভয় নেই চিন্তা নেই, তোমরা বেহেশতের সুসংবাদ শ্রবণ কর। (সূরা হামীম সিজদাহ ঃ ৩০)
لاَ يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُوْنَ لاَ يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الاَكْبَرُ "বেহেশবাসীরা জাহান্নামের আওয়াজ শুনতে পাবে না। তাদের মন যা চাবে বেহেশতে স্থায়ীভাবে তা পাবে কোনরূপ ভয় বা আতঙ্ক তাদের স্পর্শ করবে না।" কুরআনে আরো বলা হয়েছেঃ لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلاَ كِذَّابًا তারা সেখানে কোন অনর্থক অবাঞ্ছিত মিথ্যা কথা শুনতে পাবে না। (সূরা আন নাবা ঃ ৩৫)

জান্নাতের স্তর সমূহ

জান্নাত মোট আটটি। তন্মধ্যে সাতটি আল্লাহর নেক বান্দাদের আবাসের জন্য এবং একটি শুধু আল্লাহ তাআলার দিদার লাভের জন্য নির্দিষ্ট। স্তর অনুযায়ী জান্নাতের আটটি নাম হচ্ছে। যথাক্রমেঃ

১.জান্নাতুল ফিরদাউস ২. দারুল মাকাম ৩. জান্নাতুল মাওয়া ৪. দারুল কারার ৫. দারুস সালাম ৬. জান্নাতুল আদন ৭.দারুন নায়ীম ৮.দারুল খুলদ।

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيْنَ

অনুবাদ

আর তারা বলবে সেই মহান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া যিনি আমাদের সাথে কৃত তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করেলন এবং আমাদেরকে এ যমীনের উত্তরাধিকারী করে দিয়েছেন। এখন আমরা জান্নাতের যেথায় ইচ্ছা (সেথায়) বসবাস করতে পারবো।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

জান্নাতীরা বলবেন ঃ সেই মহান রবের শুকরিয়া যিনি আমাদেরকে আমাদের সাথে কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন এবং আমাদেরকে এ যমীনের উত্তরাধিকারী করে দিয়েছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ، اَلَّذِيْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لاَ يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلاَ يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ

সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের চিন্তা-দুঃখ দূর করে দিয়েছেন, নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী। যিনি আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে এই পবিত্র স্থান দান করেছেন, এখানে আমাদেরেকে কোন দুঃখ-বেদনা এবং কষ্ট ও বিপদ স্পর্শ করে না। (৩৫ ঃ ৩৪-৩৫)

মহান আল্লাহ জান্নাতীদের আরো উক্তি উদ্ধৃত করেন ঃ আল্লাহ আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যেথায় ইচ্ছা বসবাস করবো। আল্লাহ পাক বলেন ঃ সদাচারীদের পুরস্কার কতই না উত্তম!

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُوْنَ

আমি যিকরের বা উপদেশের পরে যবূরে লিখে দিয়েছিলাম যে, আমার সৎ বা যোগ্যতা সম্পন্ন বান্দারা যমীনের ওয়ারিস হবে। (২১ ঃ ১০৫) এজন্যেই তারা বলবে, জান্নাতে যেথায় ইচ্ছা আমরা বসবাস করবো। এটাই হলো আমাদের আমলের উত্তম পুরস্কার। (ইবনে কাসীর ঃ ৩৭০)

وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ جَنّٰتُ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ

"মুত্তাকীগণ আখিরাতে অতি উত্তম আশ্রয় লাভ করবে। তা হতে তাদের জন্য চিরস্থায়ী আবাস। তাদের জন্য জান্নাতুল আদনের দরজা সমূহ উন্মুক্ত রয়েছে।"

ভু-পৃষ্ঠকে আল্লাহ তাআলা অভিনব আকৃতিতে জান্নাতে পরিণত করবেন। নেক ও মুত্তাকি বান্দাগণই উহার মালিক হবেন। সৎকর্মশীলদেরকে জান্নাত দেয়া হবে। তারা সেখানে পুরা ক্ষমতা এখতিয়ার লাভ করবেন। তাছাড়া জান্নাতীগণকে নিজেদের প্রাসাদ ও বাগবাগিচা লাভ করার সাথে অন্যান্য জান্নাতীগণের সাক্ষাত লাভ ও ঘুরে বেড়ানোর জন্য অনুমতি দেয়া হবে।

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অনুবাদ

আরো তুমি দেখতে পাবে যে, ফেরেশতারা আরশের চারিদিকে ঘিরে তাদের রবের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে। মানুষের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করে দেয়া হবে ঘোষণা করা হবে। সারা বিশ্ব জাহানের রবের জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লাহ তাআলা যখন জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের ফায়সালা শুনিয়ে দেয়া এবং তাদেরকে তাদের আবাসস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়ার অবস্থা বর্ণনা করা হতে ফারেগ হয়ে এবং তাতে নিজের ইনসাফ প্রমাণ করলেন, তখন এই আয়াতে তিনি স্বীয় নবী (স) কে সংবাদ দিলেন যে, হে নবী (স)

কিয়ামতের দিন তুমি ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চার দিকে ঘিরে তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর সমস্ত মাখলূকের মধ্যে ন্যায়ের সাথে বিচার করা হবে। সরাসরি ন্যায় বিচার ও করুণাপূর্ণ ফায়সালায় খুশী হয়ে সারা বিশ্বজগত আল্লাহর গুণকীর্তন করতে শুরু করবে এবং প্রাণী ও নির্জীব বস্তু হতে শব্দ উঠবে ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ সমুদয় প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য। যেহেতু ঐ সময় প্রত্যেক শুষ্ক ও সিক্ত জিনিস আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করবে সেই হেতু এখানে مجهول বা কর্মবাচ্যের রূপ আনয়ন করে কর্তাকে عام বা সাধারণ করা হয়েছে। হযরত কাতাদা (রা) বলেন যে, মাখলূককে সৃষ্টি করার সূচনা ও হয়েছে আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।" (৬ ঃ১) আর মাখলূকের পরিসমাপ্তিও হয়েছে প্রশংসা দ্বারা। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থাৎ "তাদের মধ্যে বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে; বলা হবে- প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য।"

শিক্ষা

১. কাফিরদেরকে অসম্মানের সাথে হাঁকিয়ে জাহান্নামে নেয়া হবে।
২. ঈমানদারদেরকে সম্মানের সাথে দলে দলে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে।
৩. কাফিরেরা জাহান্নামের রক্ষীদের প্রশ্নের জবাব দিতে অক্ষম হবে।
৪. ঈমানদারগণ জান্নাতে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন।
৫. সেদিন সমস্ত প্রশংসা ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য বিঘোষিত হবে।

৭

ইসলামের বিজয়ের সূচনা

৪৮. সূরা আল-ফাত্হ

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত-২৯, রুকু-৪

আলোচ্য আয়াত ঃ ২৭-২৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(٢٧) لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُؤُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لاَ تَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحاً قَرِيْباً (٢٨) هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْداً (٢٩) مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ

وَرِضْوَاناً سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِيْ التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِيْ الْإِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيْماً.

অনুবাদ ঃ (২৭) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে। তোমাদের কেহ কেহ মস্তক মুন্ডিত করবে আর কেহ কেহ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহ জানেন তোমরা যা জান না। ইহা ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়। (২৮) তিনিই তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য দীন সহকারে প্রেরণ করেছেন অপর সমস্ত দীনের উপর উহাকে জয়যুক্ত করার জন্য। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। (২৯) মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল; তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের লক্ষণ তাদের মুখ মন্ডলে সিজদার প্রভাবে পরিস্ফুট থাকবে; তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপ এবং ইঞ্জিলেও তাদের বর্ণনা এরূপই। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশালয়। অতপর ইহা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ় ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এ ভাবে আল্লাহ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।

শব্দার্থ ঃ لَقَدْ ঃ ঃ নিঃসন্দেহে। صَدَقَ ঃ বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا ঃ তাঁর রাসূলের স্বপ্নকে। بِالْحَقِّ ঃ যথাযথ ভাবে সত্যে পরিণত করে। لَتَدْخُلُنَّ ঃ অবশ্যই প্রবেশ করবে। الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ঃ মসজিদে হারামে। إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ঃ আল্লাহর ইচ্ছায়, যদি আল্লাহ চান। آمِنِيْنَ ঃ নিরাপদে। مُحَلِّقِيْنَ ঃ মুন্ডানো অবস্থায়। رُؤُوْسَكُمْ ঃ তোমাদের মাথা। مُقَصِّرِيْنَ ঃ চুল কর্তন করা অবস্থায়। لاَ تَخَافُوْنَ ঃ তোমরা ভীত হবে না। هُوَ الَّذِيْ ঃ তিনিই (সেই পবিত্র সত্তা) যিনি। أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ ঃ তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। بِالْهُدٰى ঃ পথ নির্দেশ সহকারে। وَدِيْنِ الْحَقِّ ঃ সত্য দীন সহকারে। لِيُظْهِرَهُ ঃ তাকে বিজয়ী করার জন্য। عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ঃ অপর সমস্ত দীনের ওপর। وَكَفٰى بِاللّٰهِ ঃ আল্লাহই যথেষ্ট। شَهِيْدًا ঃ সাক্ষ্য দানকারী হিসেবে। مُحَمَّدٌ ঃ মুহাম্মদ (স)। رَسُوْلُ اللّٰهِ ঃ আল্লাহর রাসূল। أَشِدَّاءُ ঃ অতিকঠোর। عَلَى الْكُفَّارِ ঃ কাফিরদের প্রতি। رُحَمَاءُ ঃ সহানুভূতিশীল, দয়ালু। بَيْنَهُمْ ঃ পরস্পরের মধ্যে। تَرَاهُمْ ঃ তুমি তাদেরকে দেখবে। رُكَّعًا ঃ রুকু অবস্থায় سُجَّدًا ঃ সিজদারত। يَبْتَغُوْنَ ঃ তারা কামনা করে। فَضْلاً ঃ করুনা। مِّنَ اللّٰهِ ঃ আল্লাহ তাআলার وَرِضْوَانًا ঃ এবং সন্তোষ। سِيْمَاهُمْ ঃ তাদের চিহ্ন। وُجُوْهِهِمْ ঃ তাদের চেহারায় বিদ্যমান। مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ ঃ সিজদার চিহ্ন। ذٰلِكَ ঃ তা। مَثَلُهُمْ

فِيْ : তাদের এমন গুণাবলি। فِي التَّوْرَاةِ : যার উল্লেখ রয়েছে তাওরাতে।

الْاِنْجِيْلِ : যার উল্লেখ রয়েছে ইঞ্জিলে। كَـزَرْعٍ : এমন একটি কৃষি ক্ষেতের

ন্যায়। أَخْرَجَ : যে বের করে। فَآزَرَهٗ : অতঃপর সে এটাকে দৃঢ় করেছেন।

فَاسْتَغْلَظَ : ফলে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। غَلَظَ : মোটা ও তরু-তাজা হয়েছে।

فَاسْتَوٰى : অতপর তা সোজা হয়েছে। عَلٰى سُوْقِهٖ : নিজের কান্ডের উপর।

يُعْجِبُ : তা খুশি করে দেয়। الزُّرَّاعَ : কৃষকদেরকে। لِيَغِيْظَ : যাতে

ক্রোধান্বিত করতে পারে। بِهِمْ : তাদের দ্বারা। الْكُفَّارَ : কাফেরদেরকে।

وَعَدَ اللّٰهُ : প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। الَّذِيْنَ : ঐ সব

লোকদের ব্যাপারে যারা। آمَنُوْا : ঈমান এনেছে। وَعَمِلُوْا : এবং আমল

করেছে। الصَّالِحَاتِ : নেক। مِنْهُمْ : তাদের মধ্য হতে। مَّغْفِرَةً : ক্ষমা।

وَأَجْرًا : এবং প্রতিদান। عَظِيْمًا : মহা।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষপট

৬ষ্ঠ হিজরীতে মহানবী (স) স্বপ্নে দেখেন, তিনি মক্কায় নিরাপদে প্রবেশ পূর্বক কাবা শরীফ তাওয়াফ করছেন। তাঁর সাথে সাহাবীগণ মাথা মুন্ডন ও কুরবানী করছেন। তিনি এ স্বপ্নের কথা সাহাবীদের কাছে প্রকাশ করলে তাঁরা খুশি হয়ে নবীজির সাথে ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। মক্কার কুরাইশদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে নবী (স) দীর্ঘ ছয়টি বছর মদীনায় বসবাস করেন। মাতৃভূমির মায়ার টানে নবীজির মনপ্রাণ উজার হয়ে উঠেছিল প্রায়। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরামের আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য করে মহানবী (স) ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

রাসূল (স) স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও সাহাবাদের অনুপ্রেরণায় ওমরা হজ্জে যাবার ঘোষণা প্রদান করেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম ও আশে-পাশের সকল গোত্রকে ওমরার উদ্দেশ্যে রাসূলের সাথে একত্রে বের হওয়ার আহ্বান জানানো হয় কিন্তু পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গোত্র যেমন গিফার, মুযাইনা, জাহাইনা, আশজা ও ভীল গোত্রের লোকেরা রাসূল (সা) এর এই আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তারা মনে করেছিল, যেহেতু কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধাবস্থা চালু অতএব হযরত মুহাম্মদ (স) ও তার সাহাবীরা কেউ কুরাইশদের আক্রমন থেকে বেঁচে মদীনায় ফিরে আসতে পারবে না। যেমন কুরআনে এরশাদ হয়েছে।

ظَنَنْتُمْ اَنْ لَنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا

(আল্লাহ কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন) তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসুল এবং মুমিনরা তাদের পরিবারবর্গের নিকট কখনো ফিরে যেতে পারবে না। (সূরা আল-ফাতাহ ঃ ১২)

৬২৮ ইসায়ী সনের জিলকদ মাসে মহানবী (স) ১৪০০ সাহাবীর বিশাল কাফেলাকে সাথে নিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হন। কুরাইশদের সাথে সংঘাত থাকা সত্ত্বেও রাসূল (স) এর স্বপ্নের কথায় তাদের ঈমানী শক্তি বিজয়ী হয়ে ওঠে। নিশ্চিত মৃত্যুকে সামনে রেখেও তারা নিরস্ত্র অবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কাপানে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন।

মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের মক্কা আগমনের সংবাদ শুনে তাদের গতিরোধের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। তারা মুসলমানদের গতিরোধ করার জন্য খালিদ বিন ওয়ালিদ ও ইকরামা বিন আবু জেহেলকে পাঠায়। এমন পবিত্র কাজে বাধা দেয়ায় আল্লাহ তাদেরকে নিন্দা করে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেন।

কুরাইশদের রণ প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে রাসূল (স) অন্য পথে মক্কার ৯ মাইল দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন।

প্রথমে বুদাইলের মাধ্যমে মক্কাবাসীকে তাঁদের পবিত্র উদ্দেশ্যের কথা জানান। কিন্তু তারা রাসূলের কথার প্রতি কর্ণপাত না করে মুসলমানদের

মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না বলে ঘোষণা করে। পরে রাসূল (স) খারাস বিন উমাইয়াকে এবং পরে ওসমান (রা) কে পাঠান।

মক্কাবাসীরা হযরত উসমান (রা)-কে নজরবন্দী করে রাখে। এ দিকে মুসলিম শিবিরে রব উঠে যায় যে, উসমান (রা)-কে হত্যা করেছে। এতে করে মুসলমানগণ উত্তেজিত হয়ে উঠেন। উসমান (রা) এর হত্যার সংবাদ শুনে মুসলমানগণ ধৈর্যহারা হয়ে পড়েন। রাসূল (স) নিজেই এ সংবাদ শুনে ব্যথিত হন এবং হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার দরকার বলে অনুভব করেন। তাই সাহাবায়ে কেরাম (রা) রাসূল (স) এর হাতে হাত রেখে একটি বাবলা গাছের নীচে এ শপথ গ্রহণ করেন ঃ "আল্লাহর কসম আমরাও উসমান হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে জীবিত অবস্থায় ফিরে যাব না।" এ শপথ ইসলামের ইতিহাসে "বাইয়াতুর রিদওয়ান" নামে পরিচিত।

বাইয়াতে রিদওয়ানে মুসলমানদের কঠিন শপথে কুরাইশরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সন্ধি করার প্রস্তাব পাঠায়। যে সন্ধিকে হুদায়বিয়ার সন্ধি বলা হয়। কুরআনে যাকে 'ফাতহুল মুবীন' স্পষ্ট বিজয় বলা হয়েছে। এ বিজয় ছিল মুসলমানদের জন্য পরবর্তী বিজয় সমূহের মাইলফলক। আল্লাহ তাআলা হুদাইবিয়া সন্ধির স্বীকৃতি দিয়ে সূরা ফাতহে ঘোষণা করেন ঃ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا

বাইয়াতে রিদওয়ানে যারা বাবলা গাছের নিচে নবীর হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করেন তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়ে যায়।
সাথে সাথে রাসূল (স) এর মর্তবা আরো বুলন্দ হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

অবশ্যই আল্লাহ পাক মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা (বাবলা) গাছের নীচে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। (সূরা আল-ফাত্হ ঃ ১৮)
এ আয়াতের মাধ্যমে সমস্ত আসহাবে রাসূলের জন্য জান্নাতকে অবধারিত করেছেন।

لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

الاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا

কুরাইশরা হযরত উসমানকে বন্দি করে মুসলমানদের উপর আক্রমন করার কূটকৌশল চালাচ্ছিল। কিন্তু যখন মুসলমানরা নবীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন তখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উসমান (রা) কে ছেড়ে দেয় এবং সন্ধি করার জন্য রাজি হয়ে যায়।

মুসলমানরা যখন সিংহ পুরুষের ন্যায় বাইয়াতে রিদওয়ানে শপথ করছিলেন তখন কুরাইশরা মুসলমানদের সাহস, ঈমানী শক্তি ও আত্মবিশ্বাস সম্পর্ক অবগত হয়েছিল। যার কারণে মক্কা বিজয়ের সময়ে ওরা মুসলমানদেরকে বাধা দেয়নি। তাই মুসলমানরা বিনা যুদ্ধে মক্কা বিজয় করতে সক্ষম হয়েছিল।

এ দিকে সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য সুহাইল ইবনে আমর নবী কারীম (স) এর নিকট আসল। সে অনেকগুলো অসম শর্ত মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিল। নবী করীম (স) শান্তির খাতিরে সব কিছু অকপটে মেনে নিলেন। সন্ধি চুক্তি লিখার সময় হযরত আলী (রা) মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স) লিখলে তাদের পক্ষ হতে ঘোর আপত্তি উঠল। তারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ এর পরিবর্তে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখতে বাধ্য করল। এমনকি চুক্তিপত্রে বিসমিল্লাহ লিখাও তারা বরদাশত করল না। সন্ধির সমুদয় শর্তাবলি এমন ছিল যে, তা মুসলমানগণের পক্ষে মেনে নেওয়া ছিল অত্যন্ত অপমানজনক। যাদের সাথে যুদ্ধ করে জীবন দিতে সাহাবীগণ একটু পূর্বে নবী করীম (স) এর হাতে হাত রেখে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন তাদের সাথে অপমানজনক শর্তে সন্ধি করতে সাহাবীগণের (রা) এর অন্তর মোটেই সায় দিচ্ছিল না। হযরত ওমরও (রা) ক্ষোভে দুঃখে নবী কারীম (স) কে প্রশ্ন করেই বসলেন যে, আপনি যে, আল্লাহর রাসূল এটা কি সত্য নয়, আমরা যে হকের উপর রয়েছি তা কি ঠিক নয়? জবাবে নবী কারীম (স) বললেন ঃ সবই সত্য। হযরত ওমর (রা) পাল্টা প্রশ্ন রাখলেন, তা হলে নতজানু হয়ে সন্ধি করার কি হেতু থাকেত পারে? কিন্তু এত কিছুর পর

সন্ধির অন্তর্নিহিত কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে শান্তি ও সমঝোতার খাতিরে নবী করীম (স) তা মেনে নিয়েছেন। সুতরাং উপরোক্ত প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে অত্র আয়াতটি নাজিল করেদুটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

১. অত্র আয়াতে সাহাবায়ে কেরাম (রা) কে সান্ত্বনা দান করত ঃ তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স) যে আল্লাহর পক্ষ হতে সত্য রাসূল হিসেবে আগমন করেছেন তা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে সকল দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসান করা হয়েছে। মুসলমানদের উপর আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হয়ে একটি অপমানজনক সন্ধি যে তাদের চাপিয়ে দেওয়া হয়নি; বরং আল্লাহ তাআ'লা সাহাবীগণের উপর সম্পূর্ণ খোশ রয়েছেন এবং উক্ত সন্ধির মধ্যে বিশেষ হেকমত নিহিত রয়েছে- তা জানিয়ে দেওয়া আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা।

২. মুশরিকরা যে নবী কারীম (স)-কে রাসূল বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে অত্র আয়াতে তা খন্ডন করে আল্লাহ তাআলা তাকে রাসূল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা যখন হযরত মুহাম্মদ (স) কে রাসূল হিসেবে ঘোষণা করেছেন তখন মুশরিকরা কি বলল না বলল, কুরাইশরা তাকে রাসূল হিসেবে স্বীকার করল কি করল না তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। কেয়ামত পর্যন্ত সারা বিশ্বে তিনি রাসূল হিসাবেই পরিচিত থাকবেন। এমনকি পরকালেও তাকে রাসূল হিসেবেই সম্বোধন করা হবে। মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআ'লা হুদায়বিয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এর দ্বারা একদিকে মুশরিকদের বক্তব্যকে খন্ডন করা হয়েছে এবং অপরদিকে মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে।

মুসলমান ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রধান প্রধান শর্তাবলী নিম্নরূপ

১. মুসলমানগণ এ বছর হজ্জ সম্পাদন না করেই মদীনায় ফিরে যাবে।

২. ইচ্ছা করলে পরের বছর মুসলমানগণ হজ্জ করতে আসতে পারবেন। কিন্তু তারা তিন দিনের বেশি মক্কায় অবস্থান করতে পারবে না।

৩. শুধু আত্মরক্ষার জন্য কোষাবদ্ধ তরবারী ছাড়া অন্য কোন মারনাস্ত্র মুসলমানগণ সঙ্গে আনতে পারবে না। মুসলমানগণ মক্কায় তিন দিন অবস্থানের সময় কুরইশগণ মক্কানগরী ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করবে।
৪. হুদায়বিয়ার সন্ধি দশ বছর স্থায়ী হবে।
৫. কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ আগামী ১০ বছরের জন্য বন্ধ থাকবে।
৬. সন্ধির শর্তাবলী উভয় পক্ষ কর্তৃক পুরোপুরি প্রতিপালিত হবে।
৭. কোন মুসলমান মদীনা হতে মক্কায় চলে আসলে মক্কাবাসীদের ওপর তাকে প্রত্যাবর্তনের কোন দায়িত্ব বর্তাবে না।
৮. কোন মক্কাবাসী মদীনায় আশ্রয় প্রার্থনা করলে মদীনার মুসলমানগণ তাকে আশ্রয় দিতে পারবে না।

আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُؤُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لاَ تَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَالِكَ فَتْحاً قَرِيْباً.

অনুবাদ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে। তোমাদের কেহ কেহ মস্তক মুন্ডিত করবে আর কেহ কেহ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহ জানেন তোমরা যা জান না। ইহা ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আলোচ্য আয়াত কয়টি হুদায়বিয়ার সে ঐতিহাসিক অজেয় ঘটনা প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছে। নবী করীম (স) ওমরাহ পালনের যে দৃশ্য স্বপ্নযোগে দেখতে পেয়েছেন তা যে সম্পূর্ণ সত্য এবং তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

এখানে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা নবী করীম (স) কে সত্য স্বপ্নই দেখিয়েছেন। আল্লাহ চান রাসূল (স) এর স্বপ্ন মোতাবেক অবশ্যই তোমরা নিরাপদে কেউ কেউ মাথার চুল মুন্ডিয়ে আবার কেউ বা তা কর্তন করে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে। কখনো তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না। সুতরাং এ বৎসর (হুদায়বিয়ার বৎসর) তোমরা যে ওমরাহ পালন করতে পারনি তাতে মর্মাহত ও ব্যথিত হওয়ার কিংবা নবী কারীম (সা) এর কিংবা স্বপ্নের ব্যাপারে সংশয় পোষণ করার কোনো কারণ নেই।

হুদায়বিয়ার সন্ধি যাকে তোমরা নিজেদের জন্য গ্লানিকর-অপমানজনক মনে করেছ, তাতে যে তোমাদের জন্য কত অধিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহই ভালো অবগত রয়েছেন, তা তোমাদের জ্ঞাত ছিল না। এখানে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য যে শুধু মক্কায় প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছেন তাই নয়; বরং এটা ছাড়া তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলা নগদ বিজয় তথা খায়বর বিজয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আর এটা তোমাদের জন্য একটি অতিরিক্ত প্রাপ্তি ছাড়া আর কি?

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِيْنَ

"আল্লাহ চান অবশ্যই তোমরা নিরাপদে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে।"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, আলোচ্যাংশে তো আল্লাহ তাআলা নিজেই ঈমানদারগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে নিরাপদে-নির্বিঘ্নে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করার সুযোগ দিবেন। সুতরাং এতে আবার ইনশাআল্লাহ বলার কি আছে? এটাকে তাঁর ইচ্ছার সাথে শর্তারোপিত করার কি অর্থ হতে পারে।

মুফাসসিরীনে কেরাম এটার তাৎপর্য উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলা এটার দ্বারা একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তা মক্কার মুশরিকরা হুদায়বিয়ার দিন নিজেদের পেশী শক্তি প্রদর্শন করেছিল। গায়ের জোরে তারা মসুলমানদের উপর এক অসম চুক্তি চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছিল। তারা ধরে নিয়েছিল যে, তারা যা চাবে তাই হবে। আসলে ব্যাপার তা নয়; বরং আল্লাহ তাআলা যা চাবেন তা-ই

হবে। আর তিনি যা চাবেন না তা কস্মিনকালেও হবে না, হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করবেন কেউই তা রুখতে পারবে না। মূলতঃ হুদায়বিয়ার বৎসর মুসলমানগণের মক্কা প্রবেশের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেননি, বিধায়ই হয়নি। যদি ইচ্ছা করতেন তা হলে মুসলমানগণ অবশ্যই মক্কায় প্রবেশ করতে পারত। আল্লাহ ইচ্ছা করলে কাফিরদের সমস্ত দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে তাদেরকে মুসলমানদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করাতে পারতেন।

مُحَلِّقِيْنَ رُؤُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ

হজ্জ ও ওমরায় মাথা মুণ্ডানো বা চুল কর্তন করা বিধান

حَلْقٌ এর অর্থ হল মাথা মুণ্ডানো এবং قَصْرٌ শব্দের অর্থ হলো মাথার চুল কর্তন করা। হজ্জ ও ওমরার মধ্যে মাথার চুল মন্ডানো অথবা চুল কর্তন করা ওয়াজিব। হজ্জ ও ওমরার সমাপ্তি পর্যায়ে হলক বা কসর করা হয়ে থাকে। হলক বা কসর না করা পর্যন্ত হজ্জ ও ওমরা কাজের নিয়ত হতে মুক্ত হওয়া যায় না। হজ্জ বা ওমরা পালনকারীদের যাবতীয় কার্যাদি শেষ করত হলক বা কসর করে ইহরামের কাপড় খুলতে হয়। হজ্জ ও ওমরা পালনকারীর জন্য হলক বা কসর যে কোন একটি করলেই চলবে। তবে এতদুভয়ের মধ্যে হলকই হল উত্তম।

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْداً

অনুবাদ

তিনিই তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য দীনসহকারে প্রেরণ করেছেন অপর সমস্ত দীনের উপর উহাকে জয়যুক্ত করার জন্য। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

মুনাফিকদের অপপ্রচারের তোপের মুখে তোমাদের বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা, দীনকে বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ তাআলা

তাঁর রাসূল কে পাঠিয়েছেন। সুতরাং সমস্ত বাতিল দীনসমূহের উপর এ সত্য দীনকে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই বিজয়ী করবেন। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন ঃ আর নবী কারীম (স) কে আল্লাহ তাআলা যে দীনে হক ও হেদায়েতসহ পাঠিয়েছেন তারই সাক্ষ্য দানের জন্য খোদ আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট অন্যরা কি বলল, না বলল তাতে কিছুই যায় আসে না।

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلٰى الدِّيْنِ كُلِّهِ

তিনি আল্লাহ যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য (দীন) জীবন ব্যবস্থা সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি এ দীনকে অন্য সব বাতিল ব্যবস্থা সমূহের উপর বিজয়ী করেন। (সূরা আত-তাওবা ঃ ৩৩, সূরা আস-সফ ঃ ৯)

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ أَشِدَّاءُ عَلٰى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَاناً سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِيْ التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِيْ الْإِنْجِيْلِ

অনুবাদ

মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল; তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের লক্ষণ তাদের মুখ মন্ডলে সিজদার প্রভাব পরিস্ফুট থাকবে; তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপ এবং ইঞ্জিলেও তাদের বর্ণনা এরূপই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

সূরায়ে আল- ফাতহ- এর এই শেষ আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা নবী কারীম (স) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা) এর চরিত্র ও গুণাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেছেন। এতে তাদের ক্রমোন্নতি ও সাফল্যের উল্লেখ করেছেন।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবীগণ (রা) কাফিরদের উপর অতি কঠোর ও নির্দয়। অপরদিকে তারা নিজেদের পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তাদের রুকু ও সিজদারত অবস্থায় দেখা যায়- তারা নামাজ পড়ে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট সদা নত হয়ে থাকে। তারা সর্বদা আল্লাহ তাআলার মেহেরবানী ও সন্তোষের প্রত্যাশী থাকে। আল্লাহর করুনা ও সন্তুষ্টিই তাদের জীবনের একমাত্র চাওয়া ও পাওয়া বৈ আর কিছু নয়। সিজদার চিহ্নের কারণে তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে বিশেষ পরিচিতি প্রতীক। কেয়ামতের দিবসে তথা পরকালে তাদের চেহারায় এমন জ্যোতি পরিলক্ষিত হবে যার দ্বারা বুঝা যাবে যে, তারা দুনিয়ায় সিজদা করত, নামাজ পড়ত।

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব ও তাওরাত ও ইনজিলেও তাদের অনুরূপ পরিচয় ও সিফাতের উল্লেখ রয়েছে। এখানে আল্লাহ তাআলা সাহাবীগণ (রা) এর পাঁচটি গুণ বা সিফাতের উল্লেখ করেছেন।

১. اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ তাঁরা কাফিরদের প্রতি অতিশয় কঠোর ও নির্দয়।

এই আয়াতের প্রথমে নবী (স) এর বিশেষণ ও গুণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তিনি আল্লাহ তাআলার সত্য রাসূল। তারপর তাঁর সাহাবীদের (রা) গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তাঁরা কাফিরদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনকারী এবং মুসলমানদের প্রতি বিনয় ও নম্রতা প্রকাশকারী। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ

তারা মমিনদের সামনে নরম ও কাফিরদের প্রতি কঠোর। (মায়েদা ঃ ৫৪)

প্রত্যেক মুমিনেরই এরূপ স্বভাব হওয়া উচিত যে, সে মুমিনদের সামনে বিনয় প্রকাশ করবে এবং কাফিরদের সামনে হবে কঠোর। অন্যত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের পার্শ্ববর্তী কাফিরদের সাথে জিহাদ কর, তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করে। (সূরা আত তাওবা ঃ ১২৩)

রাসূল (স) বলেছেন ঃ পারস্পারিক প্রেম প্রীতি ও নম্রতার ব্যাপারে মুমিনদের দৃষ্টান্ত একটি দেহের মত। যদি দেহের কোন অঙ্গে ব্যথা হয় তবে সারা দেহ ব্যথা অনুভব করে ও অস্থির থাকে। জ্বর হলে নিদ্রা হারিয়ে যায় ও জেগে থাকতে হয়।

রাসূল (স) আরো বলেছেন ঃ এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য প্রাচীর বা দেয়াল স্বরূপ যার এক অংশ অপর অংশকে দৃঢ় ও শক্ত করে। তারপর তিনি এক হাতের অঙ্গুলিগুলো অপর হাতের অঙ্গুল গুলোর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে দেন। (ইবনে কাসীর ঃ ৮২০)

কাফিরদের মধ্যে সাহাবীগণের মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পুত্র-কন্যা, পাড়া-প্রতিবেশি ও বন্ধু-বান্ধবও অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু ইসলামের খাতিরে, দীন-ইসলামকে হেফাযত করার নিমিত্তে তারা সকলে সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। আর উক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ এটা নয় যে, তাঁরা কেবল সর্বদা কাফিরদের সাথে রুঢ় ও কর্কশ ভাষা ব্যবহার করতেন, তাদেরকে সর্বক্ষণ গালমন্দ করতে থাকতেন; বরং এর অর্থ হলো তাঁরা সর্বদা নিজেদের ঈমানের পরিপক্কতা, নীতিতে অবিচলতা, চরিত্রের বলিষ্ঠতা ও ঈমানী দূরদৃষ্টির বলিষ্ঠতায় কাফিরদের সামনে দুর্জয় অনমনীয়, পাথরসম হয়ে রয়েছেন। তাঁরা মোমের মতো নরম নয় যে, কাফিররা তাদেরকে যেদিকে ইচ্ছা ঘুরাবে, আর নরম ঘাসের মতোও নয় যে সহজেই তাদেরকে চিবিয়ে ফেলা যাবে। তাঁরা নীতিবান। নীতির প্রশ্নে তাঁরা অটল-অবিচল। কোনো ভয়ভীতি বা প্রলোভনের কাছে তারা মাথা নত করার নয়।

২. তাদের দ্বিতীয় গুণ হলো رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল ও মমত্বপূর্ণ। মুমিনগণ একে অপরের প্রতি সর্বদাই সহানুভূতিশীল ও দয়াবান। আর তাও কোন পার্থিব স্বার্থের জন্য নয়; বরং একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই তারা একে অপরকে ভালবেসে থাকেন। দীনি ভাইয়ের ভালবাসাকে তারা ঈমানের অঙ্গ হিসেবে গণ্য করে। স্বীয় দীনি ভাইয়ের প্রতি কোনোরূপ হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করাকে তারা নিজের ঈমানী চেতনা ও তাকওয়ার পরিপন্থি কাজ হিসেবে মনে করে থাকেন।

মোটকথা, তারা কাউকে ভালবাসলে তা যেমন কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে তেমনটি কাউকে ঘৃণা করলে কারো প্রতি কঠোরতা পোষণ করলে তাও শুধুমাত্র আল্লাহর সুন্তুষ্টির খাতিরেই করে থাকেন।

৩. ঈমানদারদের তৃতীয় গুণের উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا "তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা রুকু সিজদায় পড়ে রয়েছে।"

এখানে মূলত ঃ সাহাবায়ে কেরাম (রা) এর নামাজের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর সাথে তাদর কিরূপ সম্পর্ক রয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর সাথে রয়েছে তাদের গভীর সম্পর্ক। আল্লাহর ইবাদতে তারা সদা বিভোর।

৪. সাহাবীগণ (রা) এর চতুর্থ গুণ উল্লেখ করতঃ ইরশাদ হচ্ছে- يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا "তারা আল্লাহ তাআলার করুণা ও সন্তুষ্টি অন্বেষণকারী।

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন ও তার করুণা লাভ করাই তাদের জীবনের একমাত্র অভিলাষ ও কামনা। আল্লাহর প্রতি রয়েছে তাদের অগাধ বিশ্বাস, অপরিসীম আস্থা। তারা বিশ্বাস করে, একমাত্র আল্লাহ তাআলার করুণা ও সন্তুষ্টির উপরই তাদের জীবনের ইহকালের ও পরকালের সফলতা নির্ভর করে। কাজেই আল্লাহর করুণা ভিক্ষা ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। দুনিয়া-আখেরাতে একমাত্র আল্লাহই তাদেরকে তরাইতে পারেন। পারেন তাদেরকে সকল অকল্যাণ হতে নাজাত দিয়ে কল্যাণ দ্বারা পূর্ণ করতে। আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকলে তাদের কোনো ভয় নেই, গাইরুল্লাহর সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টিতে তাদের কিছু আসে যায় না। এটাই তাদের বদ্ধমূল ধারণা-আকীদা। কাজেই সর্বদা তাঁরা আল্লাহ তাআলার মনঃতুষ্টির চেষ্টায় ব্যাপৃত।

৫. সাহাবীগণ (রা) এর পঞ্চম গুণের উল্লেখ করতে গিয়ে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ "সিজদার চিহ্নের কারণে তাদের চেহারায় বিশেষ আলামত (জ্যোতি) বিদ্যমান।"

এখানে সিজদার কারণে চেহারায় যে আলামত পরিদৃষ্ট হয় তা দ্বারা সিজদার দরুন ললাটে যে দাগ পড়ে যায় তাকে বুঝানো হয়নি; বরং এর অর্থ হলো ইবাদত ও উন্নত নৈতিকতার সেই সব লক্ষণ ও নিদর্শন যা স্বভাবতই ও আল্লাহর আনুগত্য মূলক জীবন-যাপনের কারণে মুখে ফুটে উঠে।

মূলত ঃ এটা তাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ইবাদতের বহিঃ প্রকাশ যা তাদের মুখমন্ডলে পরিস্ফুট হয়ে থাকে। যেটা দেখামাত্র বোধগম্য হয় যে, এরা নেককার ও মুত্তাকী। অপরদিকে যারা আল্লাহদ্রোহী ও অহংকারী তাদের চেহারায়ও এমন নিদর্শন থাকে যা দেখে তাদেরকে সনাক্ত করা যায়।

ذَالِكَ مَثَلُهُمْ "সাহাবীগণ (রা) এর উপরোক্ত গুণাবলী যে শুধু কুরআনে মাজীদেই উল্লেখ করা হয়েছে তা নয়; বরং তাওরাত, ইঞ্জিল ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহেও এর উল্লেখ রয়েছে। (জালালাইন)

كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيْماً

অনুবাদ

তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশালয়। অতপর ইহা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ় ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এই ভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এখানে একটি উপমার মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরাম (রা) তথা ইসলামের অগ্রযাত্রা ও ক্রমোন্নতিকে তুলে ধরা হয়েছে। ফসল যেভাবে ধীরে ধীরে

প্রবৃদ্ধি লাভ করে। আজ অঙ্কুর গজায় আগামীকাল্য ডালপালা জন্মায়, তারপর কাণ্ড মজবুত হয়। অতঃপত ফুলে ফুলে ভরে উঠে। ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থাও অনুরূপ। নবী কারীম (স) এর যুগে একজন হতে দু'জন, দু'জন হতে চারজন- এভাবে ধীরে ধীরে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। ইসলাম দিনে দিনে দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হতে লাগলো। মুসলিম জাতি এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হলো। অবশ্য কোন কোন আলেমের মতে أَخْرَجَ شَطْأَهُ এর দ্বারা হযরত আবু বরক (রা) এর খেলাফতের যুগ فَـآزَرَهُ এর দ্বারা হযরত ওমর (রা) এর যুগ, فَاسْتَغْلَظَ এর দ্বারা হযরত ওসমান (রা) এর খেলাফত কাল এবং فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهٖ এর দ্বারা হযরত আলী (রা) এর খেলাফতের যুগকে বুঝিয়েছেন।

ইতিপূর্বে আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরাম (রা) এর গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। এখানে সাধারণভাবে সকলকে ক্ষমা ও অতিবড় প্রতিদান দেয়ার ওয়াদা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলার উক্ত মহান প্রতিশ্রুতির আওতায় প্রথমতঃ সাহাবীগণই (রা) পড়বেন। কেননা, আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁরা অতুলনীয় পরিশ্রম করেছেন। অপরিসীম ত্যাগ তিতিক্ষা স্বীকার করেছেন, অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছেন, নির্যাতিত ও বহিস্কৃত হয়েছেন কাজেই আল্লাহর দান ও কৃপার সর্বাধিক প্রাপ্য তারাই যে হবেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

শিক্ষা

১. হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মক্কা বিজয়ের সূচনা হয়।
২. সকল দীনের উপরে ইসলামকে বিজয়ের জন্য রাসূল (স) কে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩. মুহাম্মদ (স) ও সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন নিজেদের উপর সহনশীল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর।
৪. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সাহাবাগণ রুকু-সিজদা অবনত ছিলেন।
৫. তাঁদের বর্ণনা তাওরাত ও ইনজিলে এসেছে।
৬. নেতার সিদ্ধান্ত দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিতে হবে।

৮

সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের বিধান

৪৯. সুরা আল-হুজুরাত

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত-১৮, রুকু-২

আলোচ্য আয়াত ঃ ৬-৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(٦) يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ (٧) وَاعْلَمُوْا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ (٨) فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

অনুবাদ ঃ (৬) হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তা তোমরা ভালভাবে অনুসন্ধান করে দেখ। যাতে করে অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্থ না কর, পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদের লজ্জিত হতে হয়। (৭) আর তোমরা জেনে রাখ,

তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল (স) রয়েছেন। তিনি যদি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তোমাদের কথা মেনে চলেন তবে তোমরাই মুশকিলে পড়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ঈমানকে তোমাদের নিকট সুপ্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। উহারাই সৎপথ অবলম্বনকারী। (৮) আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। আল্লাহ তাআলা ভাল করেই জানেন। তিনি মহা প্রকৌশলী।

শব্দার্থ ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ঃ হে ঈমানদারগণ! إِنْ جَاءَكُمْ ঃ যদি তোমাদের নিকট আসে। فَاسِقٌ ঃ পাপাচারী ব্যক্তি। بِنَبَإٍ ঃ কোন সংবাদ নিয়ে। فَتَبَيَّنُوْا ঃ তাহলে তোমরা অনুসন্ধান করে দেখ। اَنْ تُصِيْبُوْا ঃ পৌঁছে দিবে। قَوْماً ঃ সম্প্রদায়। بِجَهَالَةٍ ঃ অজ্ঞতাবশত। فَتُصْبِحُوْا ঃ অতঃপর তোমরা পৌঁছবে। عَلى ঃ উপরে। مَا فَعَلْتُمْ ঃ কাজ তোমরা করবে। نَادِمِيْنَ লজ্জিত হবে। وَاعْلَمُوْا আর ঃ তোমরা জেনে রাখ। أَنَّ فِيْكُمْ ঃ তোমাদের মধ্যে رَسُوْلَ اللهِ ঃ আল্লাহর রাসূল। لَوْ يُطِيْعُكُمْ ঃ যদি তোমাদের কথা মেনে চলেন। فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْأَمْرِ ঃ তোমাদের বহু বিষয়ে। لَعَنِتُّمْ ঃ তোমরা মুশকিলে পড়বে। وَلٰكِنَّ اللهَ ঃ কিন্তু আল্লাহ। حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ঃ সুপ্রিয় করেছেন। الْإِيْمَانَ ঃ ঈমান। وَزَيَّنَهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ঃ এবং উহাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ঃ তোমাদের কাছে অপ্রিয় করেছেন। الْكُفْرَ ঃ কুফরকে। وَالْفُسُوْقَ ঃ পাপাচার। وَالْعِصْيَانَ নাফরমানী। أُوْلٰئِكَ ঃ তারাই। هُمُ الرَّاشِدُوْنَ ঃ তারাই সৎপথের অধিকারী।

সূরার নাম করণ ঃ এ সূরার ৮নং আয়াতে إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ এ আয়াতের اَلْحُجُرَاتُ (আল-হুজুরাত) শব্দটিকেই গোটা সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। হুজুরাত শব্দের অর্থ ঘরের চার দেওয়াল। এর অর্থ এই যে, এটা সে সূরা, যাতে হুজুরাত শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। এ সূরায় ১৮টি আয়াত, ২টি রুকু, ৩৪৩টি বাক্য এবং ১,৪৭৬টি হরফ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ এ সূরা বনী তামীম গোত্র সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। এ গোত্রের প্রতিনিধিরা এসে নবী (স) এর বেগমগণের হুজরাসমূহের বাইরে থেকে নবী কারীম (স) কে অভদ্রোচিত ভাষায় ডাকাডাকি শুরু করেছিল। এ প্রতিনিধি আগমনের সময়কাল ৯ম হিজরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তখন এ সূরা সামাজিক রীতি নীতি শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়।

শানে নুযুল ঃ আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূলের ব্যাপারে অধিকাংশ মুফাসসিরের বক্তব্য হল, এ আয়াতটি অলীদ ইবনে উকবা ইবনে আবু মুয়ীত সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। বনু মুসতালিক গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূল (স) তাদের থেকে যাকাত উসূল করার জন্য অলীদ ইবনে উকবাকে প্রেরণ করেন। গোত্রের লোকরা তাকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্য এগিয়ে আসছিল। কিন্তু তিনি ভয় পেয়ে লোকদের সাথে সাক্ষাৎ না করেই চলে গেলেন। আইয়্যামে জাহিলিয়াতের যুগে অলীদের বংশের সাথে এদের যুদ্ধ হয়েছিল বিধায় ব্যাপক মানুষের উপস্থিতি দেখে তিনি ভয় পেয়েছিলেন। রাসূল (স) এ সংবাদ শুনতে পেয়ে খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের মস্তক চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করার সংকল্প করলেন। ইতোমধ্যেই বনু মুসতালিক গোত্রের নেতা হারিস ইবনে জিরার উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়াইরিয়া (রা) এর পিতা নিজেই একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে নবী কারীম (স) এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি নিবেদন করলেন যে, খোদার শপথ আমরা অলীদকে দেখিনি এবং যাকাত দিতেও অস্বীকার করিনি। আর তাকে হত্যা করতেও চাইনি। আমরা যে ঈমান এনেছি তার

উপর অনড়-অবিচল রয়েছি। তাই যাকাত দিতে অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই উঠে না। অতঃপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ

অনুবাদ

হে মুমিনগণ! কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তা তোমরা ভালভাবে অনুসন্ধান করে দেখ। যাতে করে অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্থ না কর, পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদের লজ্জিত হতে হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ওয়ালীদ ইবনে উকবাকে বনী মুসতালিক গোত্রের নিকট যাকাত আদায় করার জন্য পাঠালে তাদের এলাকায় পৌঁছে সে কোন কারনে ভয় পেয়ে গেল এবং গোত্রের লোকদের কাছে না গিয়েই মদীনায় ফিরে রাসূল (স) এর নিকট এ বলে অভিযোগ করলো যে, তারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। রাসূল (স) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাদের শায়েস্তা করার জন্য একদল সেনা পাঠাতে মনস্থ করলেন। এ নাজুক পরিস্থিতিতে যখন একটি ভিত্তিহীন খবরের উপর নির্ভর করার কারনে একটি বড় ভুল সংঘটিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল সে মূহুর্তে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে এ মৌলিক নির্দেশটি জানিয়ে দিলেন যে, যখন তোমরা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর পাবে যার ভিত্তিতে বড় রকমের কোন ঘটনা সংঘটিত হতে পারে তখন তা বিশ্বাস করার পূর্বে খবরের বাহক কেমন তা যাচাই করে দেখো। সে যদি কোন ফাসেক লোক হয় অর্থাৎ যার বাহ্যিক অবস্থা দেখেই প্রতীয়মান হয় যে, তার কথা নির্ভরযোগ্য নয় তাহলে তার দেয়া খবর অনুসারে কাজ করার পূর্বে প্রকৃত ঘটনা কি তা অনুসন্ধান করে দেখো। আল্লাহর এ হুকুম থেকে শরীয়তের একটি নীতি পাওয়া যায়। যার চরিত্র ও কাজ কর্ম নির্ভরযোগ্য নয় এমন

কোন সংবাদ দাতার সংবাদের ওপর নির্ভর করে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা জাতির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামী সরকারের জন্য বৈধ নয়। (তাফহীম)

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস বলেন ঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন ফাসিক পাপাচারীর সংবাদ গ্রহণ করে কোন রূপ ব্যবস্থা নেয়া জায়েয নয়। যতক্ষণ না অন্যান্য উপায়ে তদন্ত করে সংবাদের সত্যতা প্রমাণ করা যায়। নিয়মানুযায়ী মুহাদ্দিসগণ হাদীস শাস্ত্রে যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা

جرح تعديل নীতিটির উদ্ভাবন করেছেন। এ নীতির ফলে নবী কারীম (স) এর হাদীস সমূহ যে সব লোকের মাধ্যমে পরবর্তী বংশধরদের নিকট পৌঁছেছে তাদের অবস্থা ভালভাবে যাচাই-বাছাই করে দেখতে হবে। ফিকাহবিদগণ সাক্ষ্য আইনে এই নিয়ম চালু করেছেন যে, যে ব্যাপার হতে কোন শরীয়াতী নির্দেশ প্রমাণিত হয়, কিংবা কোন ব্যক্তির উপর কোন অধিকার ধার্য হয়, তাতে ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য সাধারণ বৈষয়িক ব্যাপারাদিতে প্রত্যেকটি সংবাদের যাচাই বা পরখ করা এবং সংবাদ বাহকের বিশ্বাসযোগ্য হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিন্ততা জরুরী নয়- এ ব্যাপারে সকল বিশেষজ্ঞ মুফাসসিরের পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে কেননা আয়াতে

نبا (নাবা) যে কোন সংবাদকেই বুঝায় না; বরং গুরুত্বপূর্ণ সংবাদকেই نبا (নাবা) বলে।

وَاعْلَمُوْا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللهِ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ

অনুবাদ

আর তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল (স) রয়েছেন। তিনি যদি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে চলেন। তবে

তোমরাই মুশকিলে পড়বে। আল্লাহ তাআলা ঈমানকে তোমাদের নিকট সুপ্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। উহারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এখানে আল্লাহর বিধান ও রাসূলের আদর্শকে মানবতার জন্য নিয়ামত ও অনুগ্রহ বলা হয়েছে। আল্লাহর বিধান ও রাসূলের আদর্শের আনুগত্য ছাড়া মানুষের নিজেদের মতবাদে কোন কল্যাণ নেই- সে কথাই এ আয়াতে ঘোষিত হয়েছে। রাসূল (স) অনেক বিষয়ে স্বীয় সাহাবাদের সঙ্গে আলোচনা করে কর্তব্য নির্ণয় করতেন। এতে কারো অভিমত পরিগৃহীত হত এবং কারোটা অপরিগৃহীত হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এতে যেন সাহাবাদের হৃদয়ে কোনরূপ বিরুদ্ধ ধারণা উৎসারিত না হয়, সে জন্য আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন- হে আমার প্রিয় রাসূলের সাহাবাবৃন্দ! তোমরা ভাল করেই জেনে রাখ যে, তোমাদের মাঝে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (স) বিদ্যমান। আর এমতাবস্থায় তোমাদের সাথে আলোচনা পরামর্শ করে কোন বিষয়ে তোমাদের মতামত গ্রহণ করলেও অধিকাংশ ব্যাপারেই যদি তিনি তোমাদের অভিমত গ্রহণ করেন তবে তা তোমাদের জন্যই কঠিন বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই এ ব্যাপারে অন্য কোন ধারণার বশবর্তী হয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করা বা মন খারাপ করা ঠিক নয়, আল্লাহ তাআলা তোমাদের কল্যাণ চান বলেই তোমাদের জন্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রিয়তর এবং তোমাদের হৃদয়সমূহ তারই সৌন্দর্য মাধুর্যে বিভুষিত-বিমোহিত করেছেন। পক্ষান্তরে ফিসকী, কুফরী ও নাফরমানী তোমাদের জন্য ঘৃণার বস্তু করে তোমাদেরকে বিশ্ব নন্দিত শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করে দিয়েছেন। এটা তারই অপার অনুকম্পা ও অনুগ্রহের ফলশ্রুতি।

আজকের দুনিয়ায়ও অনেক সময় ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও এমন কোন ভুল সংবাদ অবলম্বন করে বহু অনিষ্ট সাধিত হচ্ছে। যেমন ভাবে আলিদ ইবনে উকবার সংবাদকে বিশ্বাস করে যদি সে দিন মহানবী (স) বনু মুস্তালিকের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতেন, তবে কতইনা ক্ষতি

সাধিত হত। কিন্তু মহানবী (স) এর দুরদর্শিতার কারণে কোন কোন সাহাবাদের বার বার অনতিবিলম্বে অভিযান চালনার চাপ সৃষ্টি করার পরও তা না করাতে এক নিশ্চিত বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। তাই সর্বক্ষেত্রে দায়িত্বশীলদের অনুসরণ করতে হবে কেননা আনুগত্য করা ফরয।

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদারগণকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, রাসূল (স) এর বর্তমানে তোমরা যদি লাগামহীন কথাবার্তা বল, তাহলে রাসূলে কারীম (স)-কে তো অবহিত করে দেয়া হবে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মাঝে নবী কারীম (স) বর্তমান রয়েছেন। তোমরা যদি অবাস্তব কোনো সংবাদ তাঁকে প্রদান কর, তাহলে আল্লাহ তাআলা তা ফাঁস করে দিবেন এবং তাঁকে বাস্তব ঘটনা অবহিত করে দিবেন। তোমরা তাঁকে যেসব অবাস্তব সংবাদ প্রদান করে এর অধিকাংশ অনুযায়ী যদি তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন, তাহলে পরিণামে তোমরা কষ্ট পেতে। এর জন্য তিনি দায়ী হতেন না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যেহেতু তোমাদেরকে প্রিয় বান্দা হিসাবে নির্বাচিত করেছেন, ঈমানকে তোমাদের নিকট প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে একে সুশোভিত করে দিয়েছেন; পক্ষান্তরে কুফর ফিসক ও নাফরমানীকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করে দিয়েছেন; সেহেতু তোমাদেকে মিথ্যা সংবাদের ভয়াবহ পরিণতি হতে মেহেরবানী করে হেফাজত করেছেন।

اَلاِطَاعَةُ الْكَامِلَةُ لِلرَّسُوْلُ

রাসূল (স) এর পূর্নাঙ্গ আনুগত্য করা ফরজ করে দিয়েছে।

সুতরাং তোমরা এর মর্যাদা প্রদান কর। ইহ-পারলৌকিক কোন বিষয়ে তোমরা তাঁর বিরোধিতা কর না। এরূপ ধারণা করে বস না যে, পার্থিব বিষয়াদিতে নবী কারীম (স) আমাদের অনুসরণ করবেন। তা ছাড়া তিনি তোমাদের কোনো সংবাদ বা মতামত অনুযায়ী যদি আমল না করে, তাহলে এতে মন খারাপ করো না। যা হোক নবী কারীম (স) যদি লোকজনের কথা মেনে নিতে থাকতেন, তাহলে তোমরা বিপদে পড়ে যেতে। কিন্তু আল্লাহর শুকরিয়া তিনি অনুগ্রহ করে ঈমানদারগণের অন্তরে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, ফিসক ও গুনাহকে অপ্রিয় করে দেওয়া

হয়েছে। যদ্দরুন তাদের নিকট আল্লাহ তাআলার সন্তোষ কাম্য রয়েছে। রাসূলে কারীম (স) এর আদেশ পালনের জন্য তাঁরা যে কোনো ত্যাগ তিতিক্ষা স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে। যথায় নবী কারীম (স) উপস্থিত রয়েছেন তথায় অন্য কারো ইচ্ছা ও মতামতের কিভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে?

এমনকি পার্থিব বিষয়াদীতেও নবী কারীম (স) এর আনগত্য জরুরী। তাঁর নিঃশর্ত আনুগত্য ব্যতীত ঈমান কামিল হতে পারে না। সুতরাং ঈমানদারগণ সাথে সাথেই নবী করীম (স) এর সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছেন এবং নিজেদের ঈমানকে পূর্ণাঙ্গরূপ দিয়েছেন। আজ যদিও নবী কারীম (স) আমাদের মাঝে নেই তথাপি তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ আমাদের মাঝে বর্তমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

কার কি যোগ্যতা রয়েছে তা আল্লাহ তাআলা ভাল করেই অবগত আছেন। তিনি স্বীয় হিকমতের আলোকে যে যা পেতে পারে তাকে তা দান করে থাকেন। তার প্রতিটি বিধানেই হিকমত রয়েছে- মুসলিম মনীষীগণ ও অল্পবিস্তর তা অবগত রয়েছেন।

فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيْمٌ

অনুবাদ

আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। আল্লাহ তাআলা ভাল করেই জানেন। তিনি মহা প্রকৌশলী।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ সকল লোক হিদায়াত প্রাপ্ত তাদের দীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। এটা তাদের উপর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও অনুদান। আল্লাহ তাআলা মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রকৌশলী। তিনি তাদেরকে ভাল করেই জানেন এবং তাদেরকে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে অবশ্যই কোন হিকমত (কৌশল) নিহিত রয়েছে।

সূরা আল হুজুরাতে বর্ণিত সামাজিক শিক্ষা

সূরা হুজুরাতে মুসলিম সমাজের সামাজিক বিধি বিধান কি হওয়া উচিত তার একটি নিখুঁত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

রাসূল (স) তথা নেতার অগ্রগামী না হওয়া

ঈমানের মৌলিক দাবী হচ্ছে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স) আনুগত্যের বিপরীতে নিজ মতানুযায়ী কোন কাজে অগ্রগামী না হওয়া। এটা একটা সামাজিক বিধান। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

মুমিনগণ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অগ্রগামী হয়োনা এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১)

উচ্চস্বরে কথা না বলার বিধান

আল্লামা ইউসুফ আলী বলেন ঃ রাসূল (স) এর সামনে কণ্ঠস্বরকে তাঁর কণ্ঠস্বরের চেয়ে অধিক উঁচু করা অথবা সাধারণের সাথে কথা বলার ন্যায় উচ্চস্বরে কথা বলা ধৃষ্টতা ও অন্যায় তেমনি ভাবে বর্তমান যুগে নেতার সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা অবৈধ। এই বিধানের স্বপক্ষে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَ تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ

মুমিনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উচু করো না, এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না। (সূরা হুজুরাত ঃ ২)

সাক্ষাৎ লাভের শিষ্টাচার শিক্ষা

সূরা হুজুরাতে সাক্ষাৎ লাভের শিষ্টাচার ভিত্তিক বিধান দেয়া হয়েছে।

বলা হয়েছে রাসূল (স) নিজগৃহে অবস্থান কালে বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকা, অভদ্রভাবে নাম ধরে ডাকা সম্পূর্ণ অনুচিত। তেমনিভাবে বর্তমানে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ক্ষেত্রে এ বিধানটি প্রযোজ্য। এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ

যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ। (সূরা আল-হুজুরাত ঃ ৪)

বরং এক্ষেত্রে ডাকাডাকি না করে প্রতীক্ষা করতে হবে। আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

যদি তারা আপনার বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরত তবে সেটাই তাদের জন্য মঙ্গলজনক হত। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা হুজুরাত ঃ ৫)

সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের বিধান

সূরা হুজুরাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিধান হল কোন দুষ্ট পাপাচারী ব্যক্তি যদি কোন লোক বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে তবে যথোপযুক্ত তদন্ত ব্যতীত সেই সংবাদ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবৈধ। এ প্রসঙ্গে কুরআনের ভাষ্য ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ

মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। (সূরা হুজুরাত ঃ ৬)

সমাজ নেতার আনুগত্যের বিধান

সমাজ তথা রাষ্ট্রের নেতার আনুগত্য করার বিধান সূরা হুজুরাতের একটি অন্যতম বিধান। ইসলামের রাজনৈতিক ভিত্তি হল নেতার আনুগত্য। সমাজনেতার পরামর্শের আলোকে কাজ করলেও সকল নেতার মতামতের আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহর বানী ঃ

وَاعْلَمُوْا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللهِ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ

তোমরা জেনে রাখ তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন। তিনি যদি অনেক বিষয়ে তোমাদের আবদার মেনে নেন, তবে তোমরাই কষ্ট পাবে। (সূরা হুজুরাত ঃ ৭)

পারস্পরিক কলহ মীমাংসা করা

মুসলমানদের দু'গ্রুপের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবেই হোক বা দলগত ভাবে হোক কোন প্রকার কলহ বিবাদ দেখা দিলে তা মীমাংসা করে দেয়া অন্যান্য মুসলমানদের জন্য কর্তব্য। সূরা হুজুরাতে বর্ণিত এটা একটি সামাজিক বিধান। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا

যদি মুমিনদের দুদল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে তোমরা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবে। (সূরা হুজুরাত ঃ ৯)

অন্যায় অত্যাচারীদের দমন করা

সূরা হুজুরাতে বর্ণিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিধান হল অত্যাচারীদের দমন করা। মুসলমানদের দু'দলের মধ্যে যারা অন্যায় ভাবে অত্যাচার করবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসে। অর্থাৎ শান্তি স্থাপন করতে হবে উভয় দলের মাঝে। আল্লাহর বাণী ঃ

فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقَاتِلُوْا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْءَ إِلٰى أَمْرِ اللهِ

অতপর যদি তারা একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। (সূরা আল-হুজুরাত ঃ ৯)

মুসলিম ভ্রাতৃত্বস্থাপন

আল্লামা ইউসুফ আলী বলেন ঃ অত্র সূরায় বর্ণিত আরেক সামাজিক বিধান হল ভ্রাতৃত্ব স্থাপন। সকল প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সারা বিশ্বের মুমিনদেরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে। (সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১০)

ঠাট্টা ও উপহাস না করা

সূরা হুজুরাতে আল্লাহ তাআলা সামাজিক বিধান হিসেবে উপহাস বিদ্রুপ নিষিদ্ধ করেছেন। অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এ ব্যাপারে আল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ যাকে উপহাস করা হয় সে আল্লাহর কাছে হয়তো উপহাসকারী বা উপহাসকারীনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তাইতো আল্লাহর নির্দেশ 'মুমিনগণ কেউ যেন কাউকে উপহাস না করে।' কেননা সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকে ও যেন উপহাস না করে কেননা সে উপহাসকারীনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। (সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১১)

অন্যকে দোষারোপ না করা

সূরা হুজুরাতে সামাজিক বিধান হিসেবে মহান আল্লাহ তায়ালা কারো দোষ অন্বেষণ করা, দোষ প্রকাশ করা এবং দোষের কারনে অন্যায় ভাবে ভৎর্সনা করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। সর্বোপরি কাউকে যেমন তেমনভাবে দোষারোপ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন ঃ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ তোমরা নিজেদের দোষ বের করো না। (সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১১)

মন্দ নামে না ডাকা

এ সূরায় বর্ণিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিধান হল কাউকে মন্দ নামে বা বিকৃত নামে ডাকা যাবে না। অর্থাৎ কাউকে এমন নামে আহ্বান করা যাবে না যদ্দরুণ সে অসন্তুষ্ট হয়। মন্দ নামে সম্বোধন করা মারাত্মক গোনাহ। যেমন আল্লাহর বানী ঃ

وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ

এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকোনা। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করার পর মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। (সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১১)

অধিক ধারণা না করা

আল্লাহ এ সূরার মাঝে একে অপরের ব্যাপারে অধিক ধারণা করতে নিষিদ্ধ করেছেন। কেননা কোন কোন ধারণা পাপ। হাদীসে এসেছে।

اِيَّاكُمْ وَالظَّنُّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ তোমরা ধারণা হতে বেঁচে থাক। কেননা, ধারণা মিথ্যা কথার নামান্তর। এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা থেকে বেচে থাক, নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। (সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১২)

দোষানুসন্ধান না করা

সূরা হুজুরাতে অপরের দোষানুসন্ধানকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে কোন ব্যাপারে গুপ্তচরবৃত্তি করা যাবে না। কোন মুসলমানের যে দোষ অপ্রকাশ্য তা অনুসন্ধান করা বৈধ নয়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে দোষানুসন্ধান করা যাবে। দোষানুসন্ধান না করার ব্যাপারে আল্লাহর বাণী ঃ

وَلاَ تَجَسَّسُوْا তোমরা গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। (হুজুরাত ঃ ১২)

গীবত না করা

কারো অনুপস্থিতিতে তার নিন্দা করা, যদিও বিষয়টা সত্য হয়। এমন

ধরনের পরনিন্দা তথা গীবতকে আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন। এমনকি গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমন কুরআনের ভাষ্য ঃ

وَلاَ يَغْتَبْ بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوْهُ

তোমাদের কেউ যেন পরস্পরের গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি মৃত ভ্রাতার গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত ঃ তোমরা তা অপছন্দ করবে। (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)

বংশ গৌরব না করা

অত্র সূরায় বংশ গৌরব করা অবৈধ করে দিয়ে আল্লাহ্ তাআলা মানবিক সাম্যের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রদান করেছেন। অভিজাত ও বংশ কৌলিন্যের মূলে কুঠারাঘাত করে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, সবাই একই নারী পুরুষ থেকে সৃষ্ট। যেমন আল্লাহ্‌র বানী ঃ

يَاۤ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا

হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও একই নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। (সূরা আল- হুজুরাত ঃ ১৩)

নেতা নির্বাচনের মাপকাঠি

সূরা হুজুরাতে বর্ণিত অন্যতম একটি সামাজিক বিষয় হল ঃ সম্মান ও নেতৃত্বের মাপকাঠি হতে হবে তাকওয়া বা খোদাভীরুতা আর আল্লাহর নিকটও সম্মান ও আভিজাত্যের নির্ণয়ক হলো এই তাকওয়া। এটা একটি অপ্রকাশ্য বিষয় যা শুধু আল্লাহই জানেন। অতএব কোন ব্যক্তির পক্ষেই নিজের পবিত্রতার দাবী করা বৈধ নয়। সর্বোপরি খোদাভীরুতার আধিক্যের ভিত্তিতেই নেতা নির্বাচন করতে হবে। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সর্বশ্রোতা। (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)

সর্বশেষে অত্র সূরায় মুসলমানদের এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, ঈমানের দাবী শুধু মৌখিক স্বীকৃতিতেই যথেষ্ট নয় বরং নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে জানা এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন করাই প্রকৃত ঈমানের পরিচয়। আল্লাহর বানী ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أُوْلٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ

তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে তাদের জীবন ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ। (সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১৫)

সূরা হুজুরাতে বর্ণিত বিধানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

রাসূল (স) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ সম্পর্কে ঐতিহাসিক রেমন্ডলার্জ বলেছেন ঃ এমন একটি আদর্শ সমাজ গঠনে সূরা হুজুরাতে বর্ণিত বিধানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ সকল বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আদর্শ সমাজ গঠন করা সম্ভব। নিম্নে এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

নেতার আনুগত্য করা ঃ আলোচ্য সূরার বিখ্যাত বিধান হল নেতার আনুগত্য করা। আর আনুগত্যের মাধ্যমে সমাজে বা রাষ্ট্রে শৃংখলা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সুশৃংখল সমাজ ব্যবস্থাই আদর্শ সমাজের বৈশিষ্ট্য। তাই এই বিধানের গুরুত্ব অত্যধিক।

আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা ঃ আদব ও শিষ্টাচার পালনের মাধ্যমে আদর্শ সমাজ গঠন করা যায়। পারস্পরিক আচরণের শিষ্টাচারিতা থাকলে সমাজে শান্তির সুবাতাস বইবে। আর অত্র সূরায় ভদ্রজনোচিত আচরণ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাই এ বিধানের গুরুত্ব অপরিসীম।

ব্যক্তির নৈতিক মান উন্নয়ন ঃ ব্যক্তির নৈতিক মানের উন্নতির শিক্ষা সূরা হুজুরাতের অন্যতম বিধান। মানুষের নৈতিক মান উন্নত হলে সমাজে অন্যায় অত্যাচার কমে যায়। এতে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। তাই আদর্শ সমাজ গঠনে এ বিধানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

দ্বন্দ্ব কলহের অবসান ঃ সমাজে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহের অবসান ঘটিয়ে আদর্শ সমাজ গঠন করা যায়। অত্র সূরায় দ্বন্দ্ব কলহের অবসানের বিধান প্রদান করা হয়েছে। তাই আদর্শ সমাজ গঠনে এ বিধানের গুরুত্ব অপরিমেয়।

ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ঃ মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আদর্শ সমাজ গঠন করা সম্ভব। যে কোন মিমাংসার ক্ষেত্রে ইনসাফ ভিত্তিক করার বিধান আলোচ্য সূরার অন্যতম বিধান। অতএব আদর্শ সমাজ গঠনে এ বিধানের গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূল (স) এর ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ সম্পর্কে হিট্টি বলেন ঃ আদর্শ সমাজ গঠনের অন্যতম একটি পূর্বশর্ত হল মানুষের মাঝে সুসম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। সূরা হুজুরাতে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিধান ঘোষণা করা হয়েছে। তাই এ বিধানের গুরুত্ব অত্যধিক।

গীবত না করা ঃ পরনিন্দা, উপহাস, কুধারণা, গুপ্তচরবৃত্তি ইত্যাদি অন্যায় আচরণ সমাজে দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি করে। এ সকল অন্যায় আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব বর্ণিত বিধানের গুরুত্ব রয়েছে।

সাম্য প্রতিষ্ঠা ঃ সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আদর্শ সমাজ গঠন সম্ভব। এ সূরায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, একই নারী পুরুষের বংশধর হিসেবে সকল মানুষ সমান। তাই আদর্শ সমাজ গঠনে এ বিধানের গুরুত্ব অসামান্য।

শিক্ষা

১. সংবাদের সত্যতা যাচাই করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২. নেতার আনুগত্য করতে হবে।

৩. পারস্পরিক কলহ মিমাংসা করতে হবে।

৪. অত্যাচারীদের দমন করতে হবে।

৫. আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

৯

আল্লাহর পথে খরচ

৫৭. সূরা আল-হাদীদ

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-২৯, রুকু : ৪

আলোচ্য আয়াত ঃ ১০-১৩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(١٠) وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لاَ يَسْتَوِيْ مِنْكُم مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ أَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلاًّ وَّعَدَ اللهُ الْحُسْنٰى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

(١١) مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗ أَجْرٌ كَرِيْمٌ (١٢) يَوْمَ تَرٰى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰى نُوْرُهُم بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ

الْعَظِيْمُ (١٣) يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ.

অনুবাদ ঃ (১০) আর কি কারণ রয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করছো না? অথচ পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলের উত্তরাধিকার আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পরে ব্যয় ও জিহাদ করবে, তারা কখনও সেই লোকদের সমান হতে পারে না যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় ও জিহাদ করেছে। তাদের মর্যাদা পরে ব্যয় ও জিহাদকারীদের তুলনায় অনেক বেশী। যদিও আল্লাহ তাআলা উভয়ের নিকটই ভাল প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বস্তুত ঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সব বিষয়ে অবহিত। (১১) এমন কে আছে, যে আল্লাহ তাআলাকে ঋণ দেবে, উত্তম ঋণ? যেন আল্লাহ তা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে দিতে পারেন এবং তার জন্যে অতীব উত্তম প্রতিফল রয়েছে। (১২) সে দিন যখন তোমরা মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদেরকে দেখবে যে, তাদের আলো তাদের সামনে সামনে এবং তাদের ডানদিকে দৌড়াতে থাকবে। (তাদের বলা হবে যে,) আজ সুসংবাদ রয়েছে তোমাদের জন্যে জান্নাতের। যে-সবের নিম্ন দেশে ঝর্ণা ধারাসমূহ প্রবাহমান। যাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই হল বড় সাফল্য। (১৩) সে দিন মুনাফিক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের অবস্থা এই হবে যে, তারা মুমিনদেরকে বলবেঃ আমাদের দিকে একটু লক্ষ্য কর, যেন আমরা তোমাদের আলো হতে কিছুটা উপকার লাভ করতে পারি। কিন্তু তাদেরকে বলা হবে ঃ পিছনে সরে যাও, অন্য কোথাও হতে নিজেদের জন্যে নুর সন্ধান করে নাও। অতঃপর তাদের মাঝে একটি প্রাচীরের আড়াল দাড় করানো হবে, যাতে একটা দরজা থাকবে। সেই দরজার ভিতরে রহমত থাকবে এবং বাইরে থাকবে আযাব।

শব্দার্থ ঃ وَ ঃ এবং । مَا ঃ কি । لَكُمْ ঃ তোমাদের রয়েছে । أَلاَّ ঃ যে না

তُنْفِقُوا ঃ তোমরা খরচ করছ । فِيْ ঃ মধ্যে । سَبِيْلِ ঃ পথে । اللهِ ঃ আল্লাহ । وَ

ঃ অথচ । لِلّٰهِ ঃ আল্লাহরই । مِيْرَاثُ ঃ উত্তরাধিকারী, মালিকানা । السَّمَاوَاتِ

ঃ আকাশমন্ডলের । وَ ও الْأَرْضِ ঃ পৃথিবীর । لاَ ঃ নয় । يَسْتَوِيْ ঃ সমান ।

مِنْكُم ঃ তোমাদের মধ্য হতে । مَنْ ঃ যে أَنْفَقَ খরচ করেছে । مِنْ ঃ থেকে ।

قَبْلِ ঃ পূর্বে الْفَتْحِ ঃ বিজয়ের । وَ এবং । قَاتَلَ ঃ জিহাদ করেছে । أُوْلَٰئِكَ ঃ

ঐসব লোক । أَعْظَمُ ঃ শ্রেষ্ঠতর । دَرَجَةً ঃ মর্যাদার । مِّنْ ঃ তাদের চেয়ে

الَّذِيْنَ ঃ যারা । أَنْفَقُوْا ঃ খরচ করেছে । مِنْ ঃ থেকে । بَعْدُ ঃ (বিজয়ের)

পরে । وَ ঃ ও । قَاتَلُوْا ঃ যুদ্ধ করেছে । وَ ঃ তবে । كُلاًّ ঃ প্রত্যেককে । وَعَدَ ঃ

ওয়াদা দিয়েছেন । اللّٰهُ ঃ আল্লাহ । الْحُسْنٰى ঃ উত্তম । وَ ঃ এবং । اللّٰهُ ঃ

আল্লাহ । بِمَا ঐ বিষয়ে যা । تَعْمَلُوْنَ ঃ তোমরা কাজ করছ । خَبِيْرٌ ঃ খুব

অবগত । مَنْ ঃ কে (আছে) । ذَا ঃ সেই (ব্যক্তি) । الَّذِيْ ঃ যে । يُقْرِضُ ঃ

কর্জ দেবে । اللّٰهَ ঃ আল্লাহ । قَرْضاً ঃ আল্লাহকে । حَسَناً ঃ উত্তম । فَيُضَاعِفَهُ

ঃ তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন । لَهُ ঃ তার জন্য । وَ ঃ এবং لَهُ ঃ তার জন্য । أَجْرٌ

ঃ প্রতিফল (আছে) । كَرِيْمٌ ঃ সম্মানজনক । يَوْمَ ঃ সেদিন । تَرَى ঃ তুমি

দেখবে الْمُؤْمِنِيْنَ ঃ মুমিন পুরুষরা وَ ঃ ও الْمُؤْمِنَاتِ ঃ মুমিননারীরা । يَسْعٰى

ঃ দৌড়াতে । نُوْرُهُمْ ঃ তাদের নূর । بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ ঃ তাদের সামনে । وَ ঃ

এবং। بِأَيْمَانِهِمْ ঃ তাদের ডানে। بُشْرَاكُمُ ঃ (বলা হবে) তোমাদের জন্যে সুসংবাদ। الْيَوْمَ ঃ আজ। جَنَّاتٌ ঃ এক জান্নাতের। تَجْرِيْ ঃ প্রবাহিত হয়। مِنْ تَحْتِهَا ঃ তার তলদেশে। الأَنْهَارُ ঃ ঝর্ণাসমূহ। خَالِدِيْنَ ঃ তারা স্থায়ী হবে। فِيْهَا ঃ তার মধ্যে। ذَالِكَ ঃ এটাই। هُوَ ঃ সেই। الْفَوْزُ ঃ সাফল্য। الْعَظِيْمُ ঃ বিরাট। يَوْمَ ঃ সেদিন। يَقُوْلُ ঃ বলবে। الْمُنَافِقُوْنَ ঃ মুনাফেক পুরুষরা। وَ ঃ ও الْمُنَافِقَاتُ ঃ মুনাফিক নারীরা। لِلَّذِيْنَ ঃ (তাদের) কে যারা। آمَنُوْا ঃ ঈমান এনেছিল। اُنْظُرُوْنَا ঃ আমাদের দিকে একটু দেখ। نَقْتَبِسْ (আলো নিয়ে) আমরা উপকৃত হব। مِنْ ঃ হতে। نُوْرِكُمْ ঃ তোমাদের আলো। قِيْلَ ঃ বলা হবে। ارْجِعُوْا ঃ তোমরা ফিরে যাও। وَرَاءَكُمْ ঃ তোমাদের পিছনে। فَالْتَمِسُوْا ঃ তোমরা অতঃপর সন্ধান কর। نُوْراً ঃ আলো। فَضُرِبَ ঃ অতঃপর দাড় করান হবে। بَيْنَهُم ঃ তাদের মাঝে। بِسُوْرٍ ঃ প্রাচীর। لَهُ بَابٌ ঃ তাতে একটি দরজা থাকবে। بَاطِنُهُ ঃ তার ভিতর দিকে। فِيْهِ ঃ সেখানে আছে। الرَّحْمَةُ ঃ রহমত। وَ ঃ এবং। ظَاهِرُهُ ঃ তার বহির্ভাগ। مِنْ ঃ হতে। قِبَلِهِ ঃ তার সামনের দিক। الْعَذَابُ ঃ শাস্তি।

নামকরণ ঃ আল হাদীদ আল কুরআনের ৫৭তম সূরা। এ সূরার ২৫ নং আয়াতে وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ বাক্যাংশের الحديد শব্দটিকে নিয়ে এর

নামকরণ করা হয়েছে। الحديد। এর শাব্দিক অর্থ ঃ লোহা। আলোচ্য সূরায় হাদীদ দ্বারা রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে বুঝানো হয়েছে।

শানে নুযুল ঃ সর্বসম্মত মতে এ সুরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়। সূরার বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে মনে হয় সম্ভবত উহুদ যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধির মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে এ সূরা নাযিল হয়েছে। এটা সে সময়ের কথা যখন কাফেররা চারিদিক থেকে ক্ষুদ্র এ ইসলামী রাষ্ট্রটিকে তাদের আক্রমনের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছিল আর ঈমানদারদের ক্ষুদ্র একটি দল অত্যন্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় সমগ্র আরবের মোকাবেলা করে যাচ্ছিলেন। এ কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলাম তার অনুসারীদের কাছে শুধু জীবনের কুরবানীই চাচ্ছিল না বরং সম্পদের কুরবানীর প্রয়োজনীয়তাও একান্ত ভাবে উপলব্ধি করছিল। এ ধরনের কুরবানী পেশ করার জন্য এ সূরায় অত্যন্ত জোরালো আবেদন জানানো হয়েছে। ১০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ঈমানদারদের লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা আল্লাহর পথে খরচ করছো না, অথচ আসমান ও যমীনের উত্তরাধিকার তারই। তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পরে অর্থ ব্যয় করবে ও জিহাদ করবে তারা কখনো সে সব লোকের সমকক্ষ হতে পারবে না যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, কুরআন নাযিলের ১৭ বছর পর চতুর্থ ও পঞ্চম হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে ঈমানদারদের আলোড়নকারী এ আয়াতটি নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য ঃ এ সূরার বিষয়বস্তু ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর পথে অর্থ সম্পদ ব্যয় করার আহ্বান। যখন ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে মুসলমানদের সিদ্ধান্তকর সংগ্রাম চলছিলো, ইসলামের ইতিহাসের সেই সংকটকালে মুসলামানদেরকে সাধ্যাতীতভাবে আর্থিক কুরবানীর জন্য প্রস্তুত করা এবং তাদেরকে সাচ্চা ঈমানদার বানানোই এ সূরার মূল লক্ষ্য। ঈমান যে শুধু মৌখিক স্বীকৃতি ও বাহ্যিক কিছু কাজ কর্মের নাম নয় বরং আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য একনিষ্ঠ হওয়াই তার মূল চেতনা ও প্রেরণা, একথা তাদের মনে বদ্ধমুল করে দেওয়ার জন্যই এ সূরাটি নাযিল

করা হয়েছে। যে ব্যক্তির মধ্যে এ চেতনা ও প্রেরণা অনুপস্থিত এবং আল্লাহ ও তার দীনের মোকাবিলায় নিজের প্রাণ, সম্পদ ও স্বার্থকে অধিকতর ভালবাসে তার ঈমানের দাবী অন্তসার শূন্য। আল্লাহর কাছে এ ধরনের ঈমানের কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই।

এ উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যাতে শ্রোতারা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, কোন মহান সত্তার পক্ষ থেকে তাকে সম্বোধন করা হচ্ছে। তারপর নিম্নের বিষয়গুলো ধারাবাহিক ভাবে পেশ করা হয়েছে।

১. আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে কোন গড়িমসি ও টালবাহানা না করা।
২. সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্। মানুষের কাছে তিনি তা আমানত রেখেছেন। বংশ পরমপরায় তা একজন থেকে অন্যজনের হাতে চলে যায়। সবশেষে সব সম্পদ মহান আল্লাহর কাছেই থেকে যাবে।
৩. ইসলাম বিজয়ের পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা বিজয়ের পরে ব্যয় করার চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়। যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করে ও যারা বিজয়ের পরে ব্যয় করে এ দু'দলের মর্যাদা কখনো সমান হতে পারে না।
৪. সত্য ন্যায়ের পথে ব্যয় করা আল্লাহকে কর্জে হাসানা দেয়ার সমতুল্য। আল্লাহ্ ঐ সম্পদকে কয়েকগুন বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন।
৫. আখেরাতে সেসব ঈমানদারগণ কেবল নূর লাভ করবে যারা আল্লাহর পথে তাদের অর্থ সম্পদ ব্যয় করেছে।
৬. মুনাফিকরা আল্লাহ্ প্রদত্ত নূর থেকে বঞ্চিত হবে।
৭. কাফেরদের সাথে তাদের হাশর হবে। কেবল সে সব ঈমানদারই আল্লাহর নিকট সিদ্দিক ও শহীদ বলে গণ্য যারা কোন রকম প্রদর্শনীর মনোভাব ছাড়াই একান্ত আন্তরিকতা ও সততার সাথে নিজেদের অর্থ সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে।
৮. দুনিয়ার জীবন মাত্র কয়েক দিনের চাকচিক্য ও ধোকার উপকরণ। এখানকার খেলতামাসা, আনন্দ ও আকর্ষণ, সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা, শ্রেষ্ঠত্ব, গর্ব, অহংকার এবং ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্যের ব্যাপারে একে

অপরকে অতিক্রম করার চেষ্টা সাধনা সবই অস্থায়ী। এর উপমা সেই শস্য ক্ষেত্রের মত যা প্রথম পর্যায়ে সবুজ ও সতেজ হয়ে উঠে। তারপর বিবর্ণ হয়ে তামাটে রং ধারণ করে সর্বশেষে ভূষিতে পরিণত হয়।

৯. প্রকৃত পক্ষে আখেরাতের জীবন হচ্ছে প্রকৃত ও স্থায়ী জীবন। যেখানে সব কাজের বড় বড় ফল পাওয়া যাবে। সেই জীবনের জন্যই প্রতিযোগিতা করা উচিত।

১০. আল্লাহ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, কিতাব এবং ন্যায় বিচারের ভারসাম্যপূর্ণ মানদন্ড সহকারে তার রাসূল পাঠিয়েছেন। যাতে মানুষ ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

১১. বাতিলের মাথা অবনত করার জন্য লোহা (রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি) নাযিল করেছেন। যাতে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রচন্ড শক্তি হিসাবে তা ব্যবহার করা যায়।

১২. আল্লাহ দেখতে চান মানুষের মধ্যে এমন লোক কারা যারা দীনের সহায়তা ও সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয় এবং সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। মানুষের নিজের উন্নতির জন্যই আল্লাহ এই সুযোগ সমূহ সৃষ্টি করেছেন। অন্যথায় আল্লাহ তার কাজের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নন।

১৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে ইতিপূর্বেও একের পর এক নবী রাসূল এসেছেন। তাদের আহ্বানে কিছু লোক সঠিক পথে ফিরে এসেছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই পাপাচারী রয়ে গিয়েছে। তারপর ইসা (আ) এসেছেন। কিন্তু তাঁর উম্মত বৈরাগ্যবাদের নীতি অবলম্বন করে।

১৪. সর্বশেষে আল্লাহ মুহাম্মদ (স) কে পাঠিয়েছেন। যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহকে ভয় করে জীবন পরিচালনা করবে আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ দেবেন এবং তাদেরেক এমন নূর দান করবেন যার সাহায্যে তারা দুনিয়ার বাঁকা পথ সমূহের মধ্যে সোজা পথ (সিরাতুল মুস্তাকীম) দেখে চলতে পারবে।

১৫. আহলে কিতাব নিজেদেরকে যদিও আল্লাহর রহমতের ঠিকাদার মনে করে থাকে কিন্তু আল্লাহর রহমত তাঁর নিজেরই হাতে আছে। যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি এ রহমত ও অনুগ্রহ দান করেন। তিনি বড়ই অনুগ্রশীল।

সূরা হাদীদের বিশেষত্ব

কুরআনের যে পাঁচটি সূরার শুরুতে سَبَّحَ অথবা يُسَبِّحُ আছে সেগুলোকে হাদীসে مُسَبِّحَاتٌ তথা তাসবীহযুক্ত সূরা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সূরা হাদীদ তার মধ্যে প্রথম। দ্বিতীয় হাশর, তৃতীয় ছফ, চতুর্থ জুমুআ পঞ্চম তাগাবুন। আবু দাউদ, তিরমিজী ও নাসায়ীর রেওয়ায়েতে হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) রাতে ঘুমানোর পূর্বে এসব সূরা তিলাওয়াত করতেন। তিনি আর ও বলেছেন যে, এ সব সূরায় এমন একটি আয়াত আছে, যা হাজার আয়াত হতে শ্রেষ্ঠ। ইবনে কাসীর বলেন ঃ সেই শ্রেষ্ঠ আয়াতটি হচ্ছে সূরা হাদীদের এই আয়াত-

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ

উল্লিখিত আয়াতটি শয়তানী কুমন্ত্রণা প্রতিকারের মহৌষধ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ কোন সময় তোমার অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ও ইসলাম সম্পর্কে শয়তানী কুমন্ত্রণা দেখা দিলে هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ আয়াতটি পাঠ করে নাও। (ইবনে কাসীর)

وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض

অনুবাদ

আর কি কারণ রয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করছো না? অথচ পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলের উত্তরাধিকার আল্লাহর জন্যে।

ব্যাখা-বিশ্লেষণ

মহান আল্লাহ এ আয়াতে ঈমানদারগণকে জিহাদের কাজে অর্থ সম্পদ ব্যয় করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছেন। এটা ঐ সময়ের কথা যখন একদিকে কাফের গোষ্ঠি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিল অপরদিকে রাসুল (স) এর নেতৃত্বে ইসলামকে সমুন্নত করার সিদ্ধান্তকর সংগ্রাম চলছিল। এ কঠিন পরিস্থিতিতে ইসলামী সরকার

চরমভাবে আর্থিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল। এর একটি ছিল সামরিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। আর অপরটি ছিল নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য সহযোগিতা করা যারা কাফেরদের যুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আরবের প্রতিটি অংশ থেকে হিযরত করে মদিনায় চলে এসেছিল এবং পর্যায়ক্রমে আরো আসছিল । এ ব্যয় মিটানোর জন্য সত্যিকার মুমিনগণ প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা করছিলেন। অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যে বহুসংখ্যক এমন সচ্ছল লোকও ছিল যারা কুফর ও ইসলামের এ সংঘাতকে নিছক দর্শক হয়ে দেখছিল। এ দ্বিতীয় প্রকার লোকদেরকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ বলছেন। وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ যে তোমাদের কি হয়েছে যে , তোমরা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করছ না? وَلِلّٰهِ مِيْـرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ অথচ আসমান ও জমিনের উত্তরাধিকার আল্লাহর জন্যই। অর্থ সম্পদ চিরদিন তোমাদের কাছে থাকবে না একদিন তা ছেড়ে তোমাদেরকে অবশ্যই যেতে হবে এবং আল্লাহই হবেন এর উত্তরাধিকারী। সূরা আররহমানের ২৬ ও ২৭ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ

"ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকই যিনি মহিমাময়, মহানুভব। তার মালিকানায় সবকিছুই চলে যাবে"

হে মুমিনগণ! নিজের জীবদ্দশায় নিজের হাতে কেন আল্লাহর পথে ব্যয় করছনা? আল্লাহর পথে ব্যয় করলে তোমাদের আল্লাহ পুরষ্কৃত করবেন। আল্লাহর পথে ব্যয় না করলে তোমরা কোন পুরষ্কার প্রাপ্ত হবে না। মৃত্যু বরণ করার সাথে সাথে রিক্ত, নিঃস্ব হয়ে যাবে। কবরে তোমাদের মাল সম্পদ কিছুই যাবে না একদিন সমস্ত ধন সম্পদ আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। আরেকটি অর্থ হচ্ছে আল্লাহর পথে অর্থ খরচ করতে গিয়ে তোমাদের কোন রকম দারিদ্র্য বা অস্বচ্ছলতার আশংকা করা উচিত নয়। কেননা, যে

আল্লাহর উদ্দেশ্যে খরচ করবে তিনি আসমান জমিনের সমস্ত ধন ভান্ডারের মালিক আজ তিনি তোমাদের যা দান করে রেখেছেন তাঁর কাছে দেওয়ার শুধু এতটুকুই ছিল না আগামী দিন তিনি তোমাদেরকে আরো অনেক বেশী দিতে পারেন। এ কথাটি অন্য একটি আয়াতে এসেছেঃ

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ

হে নবী তাদের বলো আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা অঢেল রিযক দান করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সংকীর্ণ করে দেন। আর তোমরা যা খরচ করো তার পরিবর্তে তিনিই তোমাদেরকে আরো রিযক দান করেন। তিনি সর্বোত্তম রিযক দাতা (সূরা সাবা ঃ ৩৯)

وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ

" তোমরা তোমাদের সম্পদ থেকে যা কিছু খরচ করে থাক তার যথার্থ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে। তোমাদের উপর কোন অবিচার করা হবে না। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৭২)

ইনফাক শব্দের অর্থ

ইন্‌ফাক শব্দটির মুল ধাতু نفـق অর্থ সুড়ঙ্গ। যার একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্য আর একদিক দিয়ে বের হয়ে যায়। এ দিক দিয়ে অর্থ দাড়ায় মু'মিনের জীবনে এক দিক দিয়ে বৈধ পন্থায় অর্থ আসবে অপর দিক দিয়ে বৈধ পন্থায় ব্যয় হবে। ফী সাবিলিল্লাহ অর্থ আল্লাহর পথে। ইকামতে দীনের প্রয়োজন পূরণ, এর উপায়-উপকরণ সংগ্রহ ও এ মহান কাজটি পরিচালনার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্যে সম্পদ খরচ করা। অতএব আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য যে অর্থ-সম্পদ প্রয়োজন তার জন্য একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে খরচ করাকেই ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ বলে।

ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ বলতে কি বুঝায়

ব্যাপক অর্থে নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনদের বৈধ প্রয়োজন পূর্ণ করা, আত্মীয়, প্রতিবেশী ও অভাবীকে সাহায্য করা, জনকল্যাণমূক কাজে অংশগ্রহণ করা এবং আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করাকে ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ বলা হয়। (সূরা আল-হজ্জ ঃ আয়াত-৩৫, তাফহীম, টীকা,- ৬৬)

আল্লাহর পথে খরচ করার নির্দেশ

আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ

"হে মুমিনগণ! তোমরা খরচ কর, আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে সেদিন আসার পূর্বেই যেদিন বেচাকেনা, কোন বন্ধুত্ব এবং কোন সুপারিশ চলবে না। (সূরা আল- বাকারা ঃ ২৫৪)

আল্লাহর পথে খরচ ও জিহাদের সম্পর্ক

আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার অর্থ হচ্ছে বিশেষত আল্লাহর দীন কায়েমের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন সে অর্থ ব্যয় করা। আল্লাহর দীন কায়েমের প্রচেষ্টা করা যেমন ফরয; তেমনিভাবে আল্লাহর এ কাজে প্রয়োজন মোতাবেক অর্থ ব্যয় করাও ফরয। মানুষের শরীরের রক্তের সাথে দেহের সম্পর্ক যেমন জিহাদের সাথে অর্থের সম্পর্ক তেমন। গাড়ীর তৈল ছাড়া যেমন গাড়ী চলে না তেমনি অর্থ ছাড়া জিহাদ চলে না। এ কারণেই মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে জিহাদের সাথে সাথে সম্পদ ব্যয় করার কথা উল্লেখ করেছেন।

وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝতে পার।” (সূরা আস-সফ ঃ ১১)

وَأَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُم مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلُ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِيْ إِلٰى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ . وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

আমি তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে খরচ তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই। অন্যথায় অনুতাপ অনুশোচনা করে বলতে হবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে যদি অল্প কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দিতে, তাহলে আমি দান খয়রাত করতাম এবং নেক লোকদের একজন হতাম। কারো মৃত্যুর নির্ধারিত সময় আসার পর আল্লাহ কাউকে অবকাশ দিবেন না। আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে ভাল ভাবে ওয়াকেফহাল। (সূরা আল- মুনাফিকুন ঃ ১০-১১)

عَنْ اَبِيْ يَحْيِ خُرَيْمِ ابْنِ فَاتِكٍ (رَضِ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) مَنْ اَنْفَقَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَهٗ سَبْعُ مِائَةِ ضِعْفٍ

হযরত আবু ইয়াহইয়া খুরাইম ইবনে ফাতিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ যে আল্লাহর পথে একটি জিনিস দান কর'লো, তার জন্যে সাতশত গুণ সাওয়াব লেখা হবে। (তিরমিযী)

অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যে আল্লাহর পথে খরচ করে সে আল্লাহ, জান্নাত ও মানুষের নিকটতম ব্যক্তি।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رَضِ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) اَلسَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَقَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ وَقَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِّنَ

النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللهِ بَعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ اَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ দানকারী আল্লাহর নিকটতম, বেহেশতের নিকটতম এবং মানুষেরও নিকটতম। আর দূরে থাকে দোযখ থেকে। পক্ষান্তরে কৃপণ ব্যক্তি অবস্থান করে আল্লাহর থেকে দূরে, বেহেশত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে, দোযখের নিকটে। অবশ্যই একজন জাহেল দাতা একজন বখিল আবেদের তুলনায় আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয়। (তিরমিযী)

لاَ يَسْتَوِيْ مِنْكُم مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ أَنْفَقُوْا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلاً وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى

অনুবাদ

তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পরে ব্যয় ও জিহাদ করবে, তারা কখনও সেই লোকদের সমান হতে পারে না যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় ও জিহাদ করেছে। তাদের মর্যাদা পরে ব্যয় ও জিহাদকারীদের তুলনায় অনেক বেশী। যদিও আল্লাহ তাআলা উভয়ের নিকটই ভাল প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

উভয়েই পুরস্কার লাভের যোগ্য। কিন্তু এক গোষ্ঠীর মর্যাদা অপর গোষ্ঠীর চেয়ে নিশ্চিত ভাবেই অনেক উচ্চতর। কারণ, অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে তারা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য অর্থ খরচ করেছে যখন কোথাও এ সম্ভাবনা পরিদৃষ্ট হচ্ছিলো না যে, বিজয়ের মাধ্যমে এ ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ হবে। তাছাড়া তারা এমন নাজুক সময়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে যখন প্রতি মুহূর্তে এ আশংকা ছিল যে, শত্রু বিজয় লাভ করে ইসলামের অনুসারীদের পিষে মারবে। মুফাসসিরদের মধ্যে মুজাহিদ, কাতাদা এবং যায়েদ ইবনে আসলাম বলেনঃ এ আয়াতে বিজয় শব্দটি দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝানো হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসির বলেন ঃ বিজয় শব্দ দ্বারা

মক্কায় বিজয়কে বুঝানো হয়েছে। হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা) বলেন ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের বললেনঃ অচিরেই এমন লোকজন আসবে যাদের আমল বা কাজকর্ম দেখে তোমরা নিজেদের কাজকর্মকে নগণ্য মনে করবে। কিন্তু

لَوْ كَانَ لِاَحَدِهِمْ جَبَلٌ مِنْ ذَهَبٍ فَانْفَقَهُ مَا اَدْرَكَ مُدَّ اَحَدِكُمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ

তাদের কারো কাছে যদি পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে আর সে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তবুও সে তোমাদের দুই রতল এমন কি এক রতল পরিমাণ ব্যয় করার সমকক্ষও হতে পারবে না। (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুইয়া, আবু নুআইম ইসফাহান)

কিন্তু এ বিশেষ ক্ষেত্রে বিজয় বলতে হুদায়বিয়ার সন্ধি কিংবা মক্কা বিজয় যাই বুঝানো হোক না কেন সর্বক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ এই নয় যে, একটি মাত্র বিজয়ে মর্যাদার পার্থক্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বরং এ থেকে নীতিগত যে কথাটি জানা যায় তা হচ্ছে, ইসলামের জন্য যখনই এমন কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যখন কুফর ও কাফেরদের পাল্লা অনেক ভারী হবে এবং বাহ্যত ইসলামের বিজয় লাভ করার কোন সুদূর সম্ভাবনা দৃষ্টি গোচর হবে না সে সময় যারা ইসলামের সহযোগিতায় জীবনপাত ও অর্থ সম্পদ খরচ করবে তাদের সমমর্যদা সে সব লোক লাভ করবে না যারা কুফর ও ইসলামের মধ্যকার ফায়সালা ইসলামের অনুকূলে হয়ে যাওয়ার পর ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করবে।

পারস্পরিক তারতম্য সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার কল্যাণ অর্থাৎ জান্নাত ও মাগফেরাতের ওয়াদা সবার জন্যই করেছেন। এই ওয়াদা সাহাবায়ে কেরামের সেই শ্রেণীদ্বয়ের জন্যে, যারা ইসলাম বিজয়ের পূর্বে ও পরে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলা করেছেন। এতে সাহাবায়ে কেরামের সমগ্র দলই শামিল। কুরআনের এই নিশ্চয়তা উম্মতে মুহাম্মদীর সে সকল মানুষের জন্যই যারা ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের যান মাল কুরবানী করে দেয়।

সূরা আম্বিয়ার একটি আয়াতে এ কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنٰى أُوْلٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ لاَ يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُوْنَ

যাদের জন্য পূর্বেই কল্যাণ নির্ধারণ করে দিয়েছি। তারা জাহান্নাম থেকে দূরে অবস্থান করবে। জাহান্নামের কষ্টদায়ক আওয়াজও তাদের কানে পৌছঁবে না। তারা চিরকাল নিজেদের পছন্দমত জিনিসের মধ্যে অবস্থান করবে। (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০১-১০২)

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

তোমরা যা করছ আল্লাহ যে সম্পর্কে অবহিত । এবং আবেগও অর্থাৎ আল্লাহ মানুষের মনের গোপন নিয়ত এবং আবেগ ও তার কাজের ধরন সবকিছুই বিচার করে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। অন্ধভাবে কোন কিছুই তিনি বন্টন করে না। তিনি এতই সূক্ষ্মদর্শী ও মহাজ্ঞানী যে তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না ।

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيْمٌ

অনুবাদ

এমন কে আছে, যে আল্লাহ তাআলাকে ঋণ দেবে, উত্তম ঋণ? যেন আল্লাহ তা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে দিতে পারেন। এবং তার জন্যে অতীব উত্তম প্রতিফল রয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এটা আল্লাহ তাআলার চরম উদারতা ও দানশীলতা যে, মানুষ যদি তাঁরই দেয়া সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করে তাহলে তিনি তা নিজের জন্য ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন। অবশ্যই শর্ত এই যে, তা কর্জে হাসানা (উত্তম ঋণ) হতে হবে। খাঁটি নিয়তে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জনেই তা দিতে হবে। অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। যদি কারো মনে প্রদর্শনীর ইচ্ছা অথবা ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তা কর্জে হাসানা হবে না। কর্জে হাসানা বা

উত্তম ঋণের জন্য আল্লাহর দুটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে। একটি হচ্ছে, তিনি তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন। অন্যটি হচ্ছে, তিনি এজন্যে নিজের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কারও দান করবেন।

হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত যখন নাযিল হয় এবং নবীর (স) পবিত্র মুখ থেকে সাহাবাগণ তা শুনতে পান তখন হযরত আবুদ দাহ্‌দাহ আনসারী (রা) জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কি আমাদের কাছে ঋণ চান? রাসূল (স) বললেন হে আবুদ দাহ্‌দাহ, হ্যাঁ। এ কথা শুনার পর তখনি আবুদ দাহদাহ (রা) নবীর (স) হাতে হাত রেখে ৬ শত খেজুর গাছ সম্বলিত প্রিয় বাগানটি আল্লাহকে কর্জে হাসানা দিলেন। সেই বাগানের মধ্যেই ছিল হযরত আবুদ দাহ্‌দাহ (রা) এর বাড়ী সেখানেই তিনি স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকতেন। আল্লাহর রাস্তায় দান করার পর আবুদ দাহদাহ (রা) সোজা বাড়ী চলে গেলেন এবং স্ত্রীকে ডেকে বললেন ঃ দাহ্‌দাহর মা বেরিয়ে এসো। আমি এ বাগান আমার রবকে ঋণ হিসাবে দিয়ে দিয়েছি। স্ত্রী বললো, দাহ্‌দাহর বাপ, তুমি অতিশয় লাভজনক কারবার করেছো" এবং সেই মুহূর্তেই সব আসবাবপত্র ও ছেলে মেয়েকে সাথে নিয়ে বাগান ছেড়ে চলে গেলেন। (ইবনে আবী হাতেম)

এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সে সময় প্রকৃত মুমিনদের কর্ম পদ্ধতি কেমন ছিল। এ কথাও বুঝা যায়, যে কর্জে হাসানাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে ফেরত দেয়ার এবং তাছাড়াও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে সম্মানজনক পুরস্কার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা কেমন।

মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে কর্জে হাসানার প্রতিদানের একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণিত আছে। এখানে তা তুলে ধরা হলো ঃ

হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী কারীম (স) বলেছেন ঃ একদা এক ব্যক্তি পানিবিহীন এক প্রান্তর দিয়ে যাচ্ছিল। সে মেঘখন্ডের মধ্যে থেকে একটি ডাক শুনতে পেলঃ অমুকের বাগানে পানি দাও। ফলে মেঘ খন্ডটি এক দিকে এগিয়ে গেল এবং একটি প্রস্তরময় ভূখন্ডে পানি বর্ষণ করল। এই পানি ছোট ছোট নালা সমূহ থেকে বড় একটি

নালার দিকে প্রবাহিত হয়ে পুরো বাগানকে বেষ্টন করে নিল। পথিক উক্ত পানির পিছনে পিছনে যেতে থাকলো। সে দেখতে পেল, একজন লোক তার বাগানে দাড়িয়ে আছে। সে তার বেলচা দিয়ে এদিকে সেদিক পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। পথিক তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর বান্দা! আপনার নাম কি? সে বলল, আমার নাম অমুক। অর্থাৎ সে ঐ নামই বলল, যা পথিক মেঘখন্ড থেকে শুনতে পেয়েছিল। বাগানের মালিক বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম কেন জানতে চাচ্ছ? সে বলল, যে মেঘ খন্ড থেকে এ পানি বর্ষিত হয়েছে তা থেকে আমি একটি আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। আপনার নামোল্লেখ করে উক্ত আওয়াজে বলা হয় ঃ অমুকের বাগানে গিয়ে পানি বর্ষাও। তা এ বাগানে আপনি এমন কি আমল করেন? সে বলল, তা তুমি যখন আমার কাছে জানতেই চাচ্ছ তাই বলছি, এ বাগানে যা কিছু উৎপন্ন হয়, আমি তার তত্ত্বাবধান করি। উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ দান করি। আমিও আমার পরিবার পরিজনের জীবিকার জন্য এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় করি এবং এক-তৃতীয়াংশ পুনরায় এতে লাগিয়ে দেই। (মুসলিম)

হাদীসের মাধ্যমে আমরা পার্থিব রিযক বৃদ্ধির প্রমাণ দেখলাম। মহান আল্লাহ জনৈক ব্যক্তির দানে খুশি হয়ে মেঘকে নির্দেশ দিলেন ঐ ব্যক্তির বাগানে বৃষ্টি বর্ষনের জন্য। বৃষ্টির পানি পেয়ে তার বাগানের ফল ফসল বহুগুনে বৃদ্ধি পায়। এমনিভাবে যে কোন বান্দা মহান আল্লাহকে কর্জে হাসানা প্রদান করলে আল্লাহ তার সহায় সম্পদ সুখ শান্তি বৃদ্ধি করবেন বিভিন্ন দিক দিয়ে যা সে টেরও পাবে না। এটা হলো পার্থিব জীবনের কথা আর পরকালের পুরস্কার হবে এর চেয়ে অনেক বেশী। মহান আল্লাহর অপার দয়ায় দানশীল ব্যক্তিগণ জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি পাবেন আর জান্নাতের পরম সুখকর স্থানে অবস্থান করবেন। দুনিয়াতে যার কোন তুলনা নেই। জান্নাতের পরম নেয়ামত কোন চোখ কোন দিন দেখেনি এবং কোন কানও কখনো শুনেনি।

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُوْرُهُم بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ

অনুবাদ

"যেদিন আপনি ঈমানদার নারী ও পুরুষদের দেখবেন তাদের 'নূর' তাদের সামনে ও ডানদিকে দৌড়াচ্ছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ আয়াতটি এবং পরবর্তী আয়াতসমূহ থেকে জানা যায় হাশরের ময়দানে শুধুমাত্র নেককার ঈমানদারদেরই নূর থাকবে। কাফের, মুনাফিক, ফাসেক ও ফাজেররা দুনিয়াতে যেমন অন্ধকারে পথ হারিয়ে হাতড়িয়ে মরেছে সেখানেও তেমনি অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরতে থাকবে। সেখানে আলো যেটুকু হবে তা হবে সৎ আকীদা বিশ্বাস ও সৎ আমলের। ঈমানের সততা এবং চরিত্র ও কর্মের পবিত্রতাই নূরে রূপান্তরিত হবে যার কারণে সৎ লোকদের ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবে। যার কর্ম যতটা উজ্জল হবে তার ব্যক্তি সত্তার আলোক রশ্মিও তত বেশী তীব্র হবে। সে যখন হাশরের ময়দান থেকে জান্নাতের দিকে যাত্রা করবে তখন তার নূর বা আলো তার আগে আগে ছুটতে থাকবে। এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে কাতাদা বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীস। এ হাদীসে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কারো কারো নূর এত তীব্র হবে যে, মদীনা থেকে আদন এর সমপরিমাণ দূরত্ব পর্যন্ত পৌছতে থাকবে। তাছাড়া কারো নূর পৌছবে মদীনা থেকে সানআ পর্যন্ত কারো তার চেয়েও কম এমনকি এমন মুমিন থাকবে যার নূর তার পায়ের তলা থেকে সামনে যাবে না (ইবনে জারীর)

অন্য কথায় যার মাধ্যমে পৃথিবীর যত বেশী কল্যাণ হবে তার নূর তত বেশী উজ্জ্বল হবে এবং পৃথিবীর যেসব স্থানে তার কল্যাণ হবে তার নূর তত বেশী উজ্জ্বল হবে এবং পৃথিবীর যে সব স্থানে তার কল্যাণ পৌছবে হাশরের ময়দানেও তার নূরের আলো ততটা দূরত্ব পর্যন্ত দৌড়াতে থাকবে।

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এর বিবরণ রয়েছে। হাদীসটি নাতিদীর্ঘ। এতে আছে যে, আবু উমামা একদিন দামেশকে এক জানাযায় শরীক হন। জানাযা শেষে উপস্থিত লোকদেরকে মৃত্যু ও পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে তিনি মৃত্যু, কবর ও হাশরের কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

অতঃপর তোমরা কবর থেকে ময়দানে স্থানান্তরিত হবে। হাশরের বিভিন্ন মনযিল ও স্থান অতিক্রম করতে হবে। এক মনজিলে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে কিছু মুখমন্ডলকে সাদা ও উজ্জ্বল করে দেয়া হবে এবং কিছু মুখমন্ডলকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ করে দেয়া হবে। অপর এক মনযিলে সমবেত সব মুমিন ও কাফেরকে গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। এর পর নূর বন্টন করা হবে। প্রত্যেক মুমিনকে নূর দেয়া হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মুমিনকে তার আমল পরিমাণে নূর দেয়া হবে। ফলে কারও নূর পবর্তসম কারও খর্জুর বৃক্ষসম এবং কারো মানবদেহসম হবে। সর্বাপেক্ষা কম নূর সেই ব্যক্তির হবে, যার কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নূর থাকবে; তাও আবার কখনও জ্বলে উঠবে এবং কখনও নিভে যাবে। অতঃপর হযরত আবু উমামা (রা) বলেন ঃ মুনাফিক ও কাফেরদেরকে নূর দেয়া হবে না।

হাশরের ময়দানে নূর ও অন্ধকার কি কি কারণে হবে ঃ

তাফসীরে মাযহারীতে হাশরের ময়দানে নূর ও অন্ধকারের গুরুত্বপূর্ণ কারণ সমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

১. হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেন ঃ যারা অন্ধকার রাত্রে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও। (আবু দাউদ, তিরমিযী)
২. হযরত ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাসময়ে ও যথানিয়মে আদায় করে, কিয়ামতের দিন এই নামায তার জন্যে নূর, প্রমাণ ও মুক্তির কারণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যথাসময়ে ও যথানিয়মে নামায আদায় করে না, তার জন্যে নূর প্রমাণ ও মুক্তির কারণ কিছুই হবে না। সে কারূন, হামান ও ফেরাউনের সাথে থাকবে। (মুসনাদে আহমদ ও তিবরানী)
৩. আবু সায়ীদ (রা) থেকে বর্নিত হাদীসে রাসূল (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্যে মক্কা মোকাররমা পর্যন্ত বিস্তৃত নূর হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সূরা কাহাফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্যে পা থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত নূর হবে। (তিবরানী)

৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াতও তেলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিন সেই আয়াত তার জন্যে নূর হবে। (মসনদে আহমদ)

৫. রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আমার প্রতি দরূদ পাঠ পুলসিরাতে নূরের কারণ হবে। (দায়লামী)

৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে একটি তীরও নিক্ষেপ করবে কিয়ামতের দিন সেই তীর তার জন্য নূর হবে। (বাযযার)

৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ (স) এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের বিপদ ও কষ্ট দূর করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে পুলসিরাতে নূরের দুটি শাখা করে দেবেন। তদ্বারা এক জাহান আলোকিত হয়ে যাবে। (তিবরানী)

৮. হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন ঃ তোমরা জুলুম ও নিপীড়ন থেকে বেঁচে থাক। জুলুমই কিয়ামতের দিন অন্ধকারের রূপ লাভ করবে। (বুখারী, মুসলিম)

উল্লেখিত হাদীস সমূহের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, প্রকৃত ঈমানদারের গুণাবলী যে ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকবে সেই ব্যক্তিই হাশরের দিন নূর বা আলো প্রাপ্ত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

অনুবাদ

(তাদেরকে বলা হবে) "আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ তোমাদের জন্য চিরসুখের জান্নাত, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা সমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। চিরদিন তোমরা এ জান্নাতে অবস্থান করবে। এটাই সবচেয়ে বড় সফলতা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ আয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে জান্নাতের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। অন্যান্য আয়াতেও জান্নাতের স্থায়ী নিয়ামতের কথা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْـرِيْ مِـن تَحْتِهَـا الْأَنْهَـارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَداً

তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে তাদের পুরস্কার হিসাবে স্থায়ী বেহেশ্‌ত। যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। (সূরা আল-বাইয়্যেনা ঃ ৮)

مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآئِمٌ

যে বেহেশতের প্রতিশ্রুতি মুত্তাকীদের দেওয়া হয়েছে এর দৃষ্টান্ত এই যে, এর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত, আর তার খাদ্য চিরস্থায়ী। (সূরা আর-রাদ ঃ ৩৫)

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِـنْ نُّوْرِكُمْ

অনুবাদ

সেদিন মুনাফিক নারী পুরুষের অবস্থা হবে যে, তারা মুমিনদের বলবে ঃ আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর যাতে তোমাদের নূর থেকে আমরা কিছু উপকৃত হতে পারি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ইমাম তিবরানী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ পুলসিরাতের নিকট আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুমিনকে নূর দান করবেন এবং প্রত্যেক মুনাফিককেও। কিন্তু পুলসিরাতে পৌঁছামাত্রই মুনাফিকদের নূর ছিনিয়ে নেয়া হবে। (ইবনে কাসীর)

তাদের নূর ছিনিয়ে নেয়ার কারণ হলো, তারা দুনিয়ায় বসে আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করতো তাই আখেরাতে আল্লাহ নূর ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে তাদেরকে ধোঁকা দেবেন। এটাই তাদের উপযুক্ত প্রতিদান। নিম্নের আয়াতে এ কথা আল্লাহ তুলে ধরেছেন।

يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ

মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ তাদেরকে ধোঁকা দেওয়ার শাস্তি দেন। (সূরা আন নিসা ঃ ১৪২)

মুমিনগণ যখন জান্নাতের দিকে যেতে থাকবে তাদেরকে সামনে নিয়ে যাওয়া হবে। আর মুনাফিকরা পেছনে অন্ধকারে ঠোকর খেতে থাকবে। সে সময় তারা ঈমানদারদেরকে ডেকে বলতে থাকবে। আমাদের দিকে একটু ফিরে তাকাও যাতে আমরাও কিছু আলো পেতে পারি। আমরা তো দুনিয়াতে তোমাদের সাথে একই সমাজে বসবাস করেছি।

قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُوْرٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ

অনুবাদ

তাদেরকে বলা হবে ঃ পিছনে সরে যাও, অন্য কোথাও হতে নিজেদের জন্যে নূর সন্ধান করে নাও। অতঃপর তাদের মাঝে একটি প্রাচীরের আড়াল দাড় করানো হবে, যাতে একটা দরজা থাকবে। সেই দরজার ভিতরে রহমত থাকবে এবং বাইরে থাকবে আযাব।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

জান্নাতবাসীগণ এ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে দরজার এক দিকে থাকবে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ আর অপরদিকে থাকবে দোযখের আযাব। যে সীমারেখা

জান্নাত ও দোযখের মাঝে আড়াল হয়ে থাকবে মুনাফিকদের পক্ষে তা অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। (তাফহীম, সূরা আল-হাদীদ ঃ টিকা ১৯)

শিক্ষা

১. আসমান ও যমীনের নিরংকুশ মালিকানা একমাত্র আল্লাহর।
২. ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য আল্লাহর পথে খরচ করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।
৩. ইসলাম বিজয়ের পূর্বে আল্লাহর পথে দান করার মর্যাদা ইসলাম বিজয়ের পরে দান করার চেয়ে বহুগুন বেশী।
৪. আল্লাহর পথে ব্যয় করাকেই আল্লাহ্ করজে হাসানা বলেছেন।
৫. কিয়ামতের কঠিন দিনে ঘুটঘুটে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে শুধু ঈমানদার ব্যক্তিগণই আল্লাহ্ প্রদত্ত নূর (আলো) লাভ করবে।

১০

জান্নাতবাসীগণই সফলকাম

৫৯. সূরা আল-হাশর

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত-২৪, রুকু-৩

আলোচ্য আয়াত ঃ ১৮-২৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(١٨) يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (١٩) وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ (٢٠) لاَ يَسْتَوِيْ أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ (٢١) لَوْ أَنزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ (٢٢) هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ

الرَّحِيْمُ (٢٣) هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٢٤) هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

অনুবাদ ঃ (১৮) হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো, প্রত্যেকেরই ভেবে দেখা উচিত আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর আল্লাহ কে ভয় করো নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। (১৯) আর তোমরা তাদের মত হয়ো না; যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে ফলে আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে আত্ম-বিস্মৃত করেছেন। তারাই পাপাচারী। (২০) জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নহে। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (২১) আমি যদি এ কুরআনকে পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনীত দেখতে। আমি এ সমস্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাতে তারা চিন্তা করে (২২) তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। (২৩) তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তিময়, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতি মহিমান্বিত। তারা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান। (২৪) তিনিই আল্লাহ যিনি সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকারী, আকৃতিদানকারী তার জন্য রয়েছে উত্তম নাম সমুহ। আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

শব্দার্থ ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُـوْا ঃ হে মুমিনগণ। اتَّقُـوْا اللهَ ঃ আল্লাহকে ভয় করো। وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ ঃ প্রত্যেকেরই ভেবে দেখা উচিত। مَّا قَدَّمَتْ لِغَـدٍ ঃ আগামী দিনের জন্য কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। وَاتَّقُـوْا اللهَ ঃ আর আল্লাহকে ভয় করো। إِنَّ اللهَ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ। خَبِيْرٌ ঃ খবর রাখেন। بِمَا تَعْمَلُوْنَ ঃ যা কিছু তোমরা করো। وَلاَ تَكُوْنُـوْا ঃ আর তোমরা হয়ো না। كَالَّـذِيْنَ ঃ তাদের মত। نَسُوا اللهَ ঃ যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে। فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ঃ ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। أُوْلَئِكَ هُـمُ الْفَاسِـقُوْنَ ঃ তারাই পাপাচারী। لا يَسْـتَوِي ঃ তারা সমান নহে। أَصْـحَابُ النَّـارِ ঃ জাহান্নামবাসী। وَأَصْـحَابُ الْجَنَّـةِ ঃ জান্নাতবাসী। أَصْـحَابُ الْجَنَّـةِ ঃ জান্নাতবাসীগণ। هُمُ الْفَائِزُوْنَ ঃ তারা সফলকামী। لَـوْ أَنْزَلْنَـا ঃ যদি আমরা অবতীর্ণ করতাম। هٰذَا الْقُرْآنَ ঃ এই কুরআনকে। عَلَـى جَبَـلٍ ঃ পাহাড়ের ওপর। لَّرَأَيْتَـهُ ঃ তবে তুমি তাকে দেখতে। خَاشِـعاً ঃ বিনীত। مُّتَصَـدِّعاً ঃ বিদীর্ণ। مِّـنْ خَشْـيَةِ اللهِ ঃ আল্লাহর ভয়ে। وَتِلْـكَ الْأَمْثَـالُ ঃ আর এ সকল উদাহরণ। نَضْـرِبُهَا ঃ আমি পেশ করি। لِلنَّـاسِ ঃ মানুষের জন্য। لَعَلَّهُـمْ ঃ যাতে তারা। يَتَفَكَّرُوْنَ ঃ চিন্তা করে। هُوَ ঃ তিনি। اللهُ ঃ আল্লাহ। الَّـذِيْ ঃ যিনি। لاَ إِلٰـهَ ঃ ইলাহ নেই। إِلاَّ هُـوَ ঃ তিনি ব্যতীত। عَـالِمُ ঃ পরিজ্ঞাতা। الْغَيْـبِ ঃ অদৃশ্যের। وَالشَّـهَادَةِ ঃ দৃশ্যের। هُـوَ ঃ তিনি। الـرَّحْمٰنُ ঃ

করুণাময়। الرَّحِيْمَ ঃ পরম দয়ালু। هُوَ اللهُ ঃ তিনিই আল্লাহ। الَّذِي ঃ যিনি। لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ঃ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। الْمَلِكُ ঃ অধিপতি। الْقُدُّوْسُ ঃ পুত-পবিত্র। السَّلاَمُ ঃ শান্তিময়। الْمُؤْمِنُ ঃ তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক। الْمُهَيْمِنُ ঃ তিনিই রক্ষণাবেক্ষণকারী। الْعَزِيْزُ ঃ শক্তিধর। الْجَبَّارُ ঃ পরাক্রমশালী। الْمُتَكَبِّرُ। মহিমান্বিত। سُبْحَانَ اللهِ ঃ আল্লাহ পবিত্র। عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ঃ তারা যাকে শরীক স্থির করে তা থেকে। هُوَ اللهُ ঃ তিনিই আল্লাহ। الْخَالِقُ ঃ সৃষ্টিকর্তা। الْبَارِئُ ঃ উদ্ভাবক। الْمُصَوِّرُ ঃ আকৃতিদানকারী। لَهُ ঃ তার জন্য। الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ঃ পবিত্র নাম সমূহ। يُسَبِّحُ لَهُ ঃ তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ঃ আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে। وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ঃ তিনিই শক্তিধর ও প্রজ্ঞাময়।

সূরার নামকরণ ঃ এ সূরার দ্বিতীয় আয়াতে 'হাশর' শব্দটির নামে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ আয়াতটি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

أَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ

এটা এমন সূরা যার মধ্যে اَلْحَشْرِ শব্দটি রয়েছে। এ সূরার অপর নাম হলো সূরা বনু নাযীর কেননা, এ সূরার মদীনা থেকে বনু নযীর গোত্রের বহিস্কারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ সুরায় ৪টি রুকু; ২৪টি আয়াত, ৭৪৬ টি বাক্য ও ১৭১২টি অক্ষর রয়েছে। (তাফসীরে রুহুল মাআনী)

নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ এ সূরাটি ৪র্থ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে বনু নাযীরের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়। (ইবনে হিশাম বালযুরী)

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে সূরা হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞসা করলে তিনি বলেন ঃ সূরা আনফাল যেমন বদর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল তেমনি সূরা হাশর বনু নাযীরের যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন ঃ قُلْ سُوْرَةُ النَّضِيْرِ অর্থাৎ এরূপ বল যে, এটা সূরা নাযীর। (বুখারী ও মুসলিম)

ঐতিহাসিক পটভূমি

রাসূল (স) মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করার পর ইহুদীদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না এবং কোন আক্রমনকারীকে সাহায্য করবে না। তারা আক্রান্ত হলে মুসলমানরা তাদের সাহায্য করবে। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বানু নাযীর গোত্রও এ চুক্তির অন্তর্ভূক্ত ছিল। তারা মদীনা থেকে দু'মাইল দূরে বসবাস করত। ৩য় হিজরীতে বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কুরাইশরা মদীনা আক্রমনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে আসলে চুক্তি অনুযায়ী মদীনা প্রতিরক্ষায় তারা রাসূলের সাথে সহযোগিতা না করে চুক্তি লঙ্ঘন করলো। এমনকি রাসূল (স)-কে হত্যা করার জন্য বনু নাযীর গোত্র একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করে বসলো। দ্বিতীয়ত ঃ ৪র্থ হিজরীতে কিছু সংখ্যক মুনাফিক ও কাফির তাদের জনপদে ইসলাম প্রচারের জন্য রাসূল (স)-এর কাছ একদল সাহাবী প্রেরণ করার আবেদন করে। তিনি সত্তর জন্য সাহাবীর একটি দল তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পরে জানা যায় যে, এটা নিছক একটা চক্রান্ত ছিল। কাফিরেরা মুসলমানদেরকে হত্য করার পরিকল্পনা করে এবং এতে তারা সফলও হয়ে যায়। সাহাবীগণের মধ্যে একমাত্র আমর ইবনে যমীর কোনরূপে পলায়ন করতে সক্ষম হন। যিনি এই কাফিরদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁর উনসত্তর জন সঙ্গীর নৃশংস হত্যা-কান্ড স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন। কাফিরদের মোকাবিলায় তাঁর মনোবৃত্তি কি হবে তা অনুমান করা কারো পক্ষে কঠিন হওয়ার কথা নয়। ঘটনাক্রমে মদীনায় ফিরে আসার সময় পথি মধ্যে তিনি

দু'জন কাফিরের মুখোমুখী হন। তিনি কাল বিলম্ব না করে উভয়কে হত্যা করেন। পরে জানা যায় যে, তারা ছিল বনী আমের গোত্রের লোক, যাদের সাথে রাসূল (স) এর শান্তি চুক্তি ছিল। (মা'আরেফুল কুরআন)

এ ভুলের কারনে মুসলমানদের জন্য তাদের রক্তপন আদায় করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাড়ায়। আর বনী আমের গোত্রের সাথে চুক্তিতে যেহেতু বনু নাযীর গোত্রও শরীক ছিল তাই রক্তপন আদায়ের ব্যাপারে তাদেরকে শরীক হওয়ার আহ্বান জানাতে রাসূল (স) স্বীয় সাহাবীদের বড় বড় দশজনকে নিয়ে বনু নাযীরের মহল্লায় যান। যাদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা) হযরত ওমর (রা) হযরত আলীও (রা) ছিলেন। সেখানে তারা নবী কারীম (স)-কে মন ভুলানো কথাবার্তায় মশগুল করে রাখলো এবং ভিতরে ভিতরে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করাতে লেগে গেল। তিনি যে ঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে ছিলেন এক ব্যক্তি তার ছাদ থেকে তাঁর উপর এক খানা ভারী পাথর গড়িয়ে দেবে। কিন্তু তারা এ ষড়যন্ত্র কার্যকরী করার আগেই আল্লাহ তাআলা যথা সময়ে তাঁকে সাবধান করে দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে মদীনায় ফিরে গেলেন। (তাফহীম)

মদীনায় গিয়ে রাসূল (স) সাহাবীদেরকে বনু নাযীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তৈরী হতে নির্দেশ দিলেন। বানী নাযীরের এ ষড়যন্ত্র ও চুক্তি ভঙ্গের কারনে রাসূল (স) অবিলম্বে তাদেরকে চরমপত্র দিলেন যে, তোমরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়েছিলে তা আমি জানতে পেরেছি। অতএব দশ দিনের মধ্যে মদীনা ছেড়ে চলে যাও। এ সময়ের পরেও যদি তোমরা এখানে অবস্থান করো তাহলে তোমাদের জনপদে যাকে পাওয়া যাবে তাকেই হত্যা করা হবে। অন্য দিকে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে খবর পাঠালো যে, আমি দুই হাজার লোক দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করবো। তাছাড়া বনী কুরাইযা এবং বনী গাতফানও তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। তোমরা দৃঢ় থাকো, নিজেদের স্থান কিছুতেই ত্যাগ করবে না। এ মিথ্যা আশ্বাস বানীর ওপর নির্ভর করে তারা নবী কারীম (স) এর চূড়ান্ত নির্দেশের জবাবে বলে পাঠালো "আমরা এখান হতে চলে যাব না, আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। এরপর চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে নবী কারীম (স) তাদেরকে অবরুদ্ধ করলেন। মাত্র কয়েক দিন পর্যন্ত অবরোধ

চলার পর কোন কোন বর্ণনা মতে ছয় দিন কোন কোন বর্ণনা অনুসারে পনের দিন তারা মদীনা ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হল এ শর্তের ভিত্তিতে যে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া আর যা কিছু তারা নিজেদের উটের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারবে তাই নিয়ে চলে যাবে। এ ভাবেই তাদের অধিকার হতে মদীনার ভূমিকে মুক্ত করা সম্ভবপর হয়েছিল। তাদের মধ্যে মাত্র দু'জন লোক মুসলম্যান হয়ে মদীনায় থেকে গেল। অবশিষ্টরা সিরিয়া ও খাইবারের দিকে চলে গেলো। বনু নাযীরের অজেয় দুর্গ ও প্রচুর যুদ্ধ সরঞ্জাম হেতু তারা ভাবতে পারেনি যে, নিরীহ মুসলমানরা তো দূরের কথা বরং কোন শক্তিই তাদের দুর্জয় কেল্লা জয় করা ও তাদের ওপর আক্রমন করার দুঃসাহস করতে পারবে। এমন দুঃসাহসিক অভিযান অতর্কিত আক্রমন এবং শোচনীয় পরাজয় তাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। (তাফহীম)

বনু নাযীরের বিরোধিতার কারণ

বনু নাযীর হযরত হারুন (আ) এর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে একটি ইহুদী গোত্র, তাদের পিতৃ পুরুষগণ তাওরাতের পন্ডিত ছিলেন। তাওরাতে খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ (স) এর সংবাদ, আকার-অবয়ব ও আলামত বর্ণিত আছে এবং তাঁর মদীনায় হিজরতের কথাও উল্লেখিত আছে। এই পরিবার শেষ নবী (স); এর সাহচর্যে থাকার আশায় সিরিয়া থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। তাদের বর্তমান লোকদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক তাওরাতের পন্ডিত ছিল এবং রাসূল (স) এর মদীনায় আগমনের পর তাকে আলামত দেখে চিনেও নিয়েছিল যে, ইনিই শেষ নবী (স) কিন্তু তাদের ধারণা ছিল যে, শেষ নবী হারুন (আ) এর বংশধরদের মধ্যে তাদের পরিবার থেকে আবির্ভূত হবেন। তা না হয়ে শেষ নবী প্রেরিত হয়েছেন বনী ইসরাঈলের পরিবর্তে বনী ইসমাঈলের বংশে। এই প্রতিহিংসা তাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনে বাধা দিল। এতদসত্ত্বেও তাদের অধিকাংশ লোক মনে মনে জানত এবং চিনত যে, ইনিই শেষ নবী। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় এবং মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় দেখে তাদের বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর স্বীকারোক্তি তাদের মুখে শোনাও গিয়েছিল। কিন্তু এই বাহ্যিক জয়-পরাজয়কে সত্য ও মিথ্যা চেনার মাপকাঠি করাটাই ছিল অসার ও দুর্বল ভিত্তি। ফলে ওহুদ যুদ্ধের প্রথম দিকে যখন মুসলমানদের বিপর্যয়

দেখে এবং কিছু কিছু সাহাবী শহীদ হলেন, তখন তাদের বিশ্বাস টলটলায়মান হয়ে গেল। এর পরই তারা মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব শুরু করে দিল।

আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

অনুবাদ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো, প্রত্যেকেরই ভেবে দেখা উচিত আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে । আর আল্লাহ্-কে ভয় করো নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পরকালের চিন্তা ও তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে ঈমানদারগণকে সচেতন করেছেন। সুতরাং তোমাদের গভীর মনোযোগের সাথে বিবেচনা করা উচিত তোমরা আল্লাহর নিষেধকৃত কার্যসমূহে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থেকে আল্লাহকে ভয় করার মাপকাঠি অনুসারে তাঁকে ভয় করে চল। কিয়ামতের দিন প্রত্যেককেই হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে। তাই হযরত আলী (রা) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ حَاسِبُوْا قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا তোমার জীবনের কৃত কর্মের হিসাব গ্রহণের পূর্বে তুমি নিজ হিসাব সঠিক করে নাও।

তাকওয়ার নির্দেশ দু'বার দেয়ার কারণ

একই আয়াতে দু'বার তাকওয়ার নির্দেশ প্রদানের কারণ হচ্ছে প্রথমবার ইসলামের নির্দেশ মোতাবেক যাবতীয় সৎকর্ম করার প্রতি তাকিদ প্রদান করা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ

দ্বিতীয়বার যাবতীয় পাপাচার হতে মানবতাকে নিষ্কলুষ রাখার উদ্দেশ্যে তাকওয়ার অবলম্বনের আদেশ দেয়া হয়েছে।

مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

তা ছাড়া তাকওয়ার নির্দেশ বারংবার দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ ভীতির প্রতি তাকিদ করা হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন ঃ প্রথম তাকওয়ার নির্দেশ দ্বারা আল্লাহর প্রেরিত আহকামগুলোর অনুসরণে পরকালীন জীবনের সম্বল তৈরী করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় তাকওয়ার নির্দেশ দ্বারা বলা হয়েছে যে, তোমরা যে সকল সম্বল প্রেরণ করছ তা অকৃত্রিম ও পরকালে চলমান ও মূল্যায়ন হবে কি না তার প্রতি লক্ষ্য করো। পরকালে অচল সম্বল বলে তাই গণ্য হবে যে আমল মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে করা হয়নি; বরং কোনো নাম, যশ বা মানবিক স্বার্থের বশীভূত হয়ে করা হয়েছে।

কিয়ামতের দিবসকে الغد (আগামী কাল) নামকরণের কারণ

এ আয়াতে কিয়ামত বুঝাবার জন্য غد শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ আগামী কাল। কিয়ামতকে غد আগামীকাল বলার কয়েকটি কারণ রয়েছে।

১. কিয়ামতকে আগামীকাল বলা হয়েছে আগামীকালের আগমন সুনিশ্চিত। কেউ এ ব্যাপারে সন্দেহ করতে পারে না। ঠিক তেমনি এ দুনিয়ার পর কিয়ামতের আগমনও সুনিশ্চিত, তাতেও কোন সন্দেহ নেই।
২. কিয়ামতকে নিকটবর্তী বুঝাবার জন্য আজকের পর আগামীকাল যেমন নিকটে তেমনি দুনিয়ার পর কিয়ামতও নিকটে (কাবীর)
৩. কিয়ামত দিবসকে আগামীকাল বলে আল্লাহ তাআলা মানুষকে বুঝাতে চান যে, যে ব্যক্তি আজকের আনন্দ ফুর্তি ও স্বাদ আস্বাদনে নিজের সবকিছু ঢেলে দেয়, কালকে তার নিকট ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাবার ও মাথা গুঁজার জন্য ঠাঁই থাকবে কি না, তার চিন্তাও করে না সে লোকটি

যেমন অজ্ঞ, মূর্খ ও অপরিণামদর্শী তেমনি সে লোকটি নিজের পায় কুঠার মারে যে লোক নিজের ইহজীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ বানাতে ব্যস্ত হয়ে পরকালের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হয়ে যায় অথবা প্রকৃত পক্ষে পরকাল ঠিক তেমনিভাবে অবশ্যই আসবে যেমন আজকের পর আগামীকাল অবশ্যই আসবে। (তাফসীরে জালালাইন)

দু'দিন পূর্বে হোক অথবা পরে হোক ইহধাম ত্যাগ করতে হবে। كُلُّ

نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ মৃত্যুর পেয়ালা সকলকে পান করতে হবে। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৩৫) মৃত্যুর পরের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা স্মরণ করে আগামী দিনের জন্য আত্ম- প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আর কিয়ামতের আসন্ন ও অশেষ দিনের জন্য কে কি অর্জন করেছো ভেবে দেখ। আর জেনে রাখ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য তথা মর্জি মোতাবেক নিজের সকল কর্ম সম্পাদন করাই পরকালের জন্য মূলধন। এ পুঁজি যে যত বেশী পরিমাণে সঞ্চয় করতে পারবে সে তত বেশি সৌভাগ্যবান।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ

অনুবাদ

আর তোমরা তাদের মত হইও না যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে ফলে আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে আত্ম-বিস্মৃত করেছেন। তারাই পাপাচারী।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ আয়াতের তাফসীরে তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন অভিমত পেশ করেছেন।

১. আল্লামা আবু হাইয়ান (র) বলেন, উক্ত আয়াতখানি "যেমন কর্ম তেমন ফল" প্রবাদের ন্যায় বলা হয়েছে। যারা মহান আল্লাহর ইবাদত সম্পর্কীয় কাজ কর্ম গুলোকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে এবং তার আদেশ নিষেধ গুলোর অবমাননা করেছে তাদেরকে প্রতিফল স্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আত্ম-বিস্মৃত করে দিয়েছেন। সুতরাং পরকালের মঙ্গলার্থে তারা কোনো কাজ আল্লাহর কৃপায় করে যেতে পারেনি।

২. কেউ বলেন, তার অর্থ ও তাফসীর এই যে, হে মুমিনগণ! তোমরা সেসব লোকের ন্যায় হয়ো না, যারা আল্লাহর জিকির ইত্যাদি ভুলে গেছে। অতঃপর তাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর কার্যসমূহ করতে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।
৩. ইমাম রাজী (র) বলেন, যারা আল্লাহর হক সম্পর্কীয় কাজ করতে ভুলে যাওয়ার ফলে তাদের নিজেদের হক হতে তাদেরকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা তাদের মত হয়ো না।
৪. কারো মতে যারা নিজেদের সুদিনে আল্লাহকে ভুলে গেছে, অতএব তাদের দুর্দিনেও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে আত্ম-বিস্মৃত করে দেয়া হয়েছে।

এ আয়াতে কাফেরদেরকে ফাসিক বলা হয়েছে?

এ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা ফাসিক বলে আল্লাহর নির্দেশ লজ্ঘনকারীদেরকে বুঝিয়েছেন। তারা হলো, যারা কবীরা গোনাহ সমূহে লিপ্ত থাকে। অথবা আল্লাহর যে কোন প্রকার নির্দেশ অবমাননাকারীগণই আয়াতের উদ্দেশ্য।

لاَ يَسْتَوِيْ أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ

অনুবাদ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নহে। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য সর্বজন স্বীকৃত এবং সর্বজ্ঞাত, তা সত্ত্বেও এরকম স্থানে তার উল্লেখ করনের উদ্দেশ্য হলো এ পার্থক্য গুলোর প্রতি সচেতন করা। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ وَلاَ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ غِسْلِيْنَ তারা তথায় গিসলীন নামক খাবার ব্যতীত অন্য কোন খাবার পাবে না।

لاَ يَمُوْتُ فِيْهَا وَلاَ يَحْيَ لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ জাহান্নামে মৃত্যু আসবে না এবং জাহান্নামীদের শাস্তি সামান্যও লাঘব করা হবে না তারা করো পক্ষ হতে সাহায্য ও পাবে না। তারা সেখানে মরবেও না বাঁচবেও না। (সূরা ত্বহা ঃ ৭৪)

لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَهُمْ يُنْصَرُوْنَ তাদের থেকে আযাবের কিছু মাত্রও লাঘব করা হবে না। জাহান্নামীরা ধৈর্যধারণ করলেও শাস্তি হতে অব্যাহতি পাবে না এবং তাদেরকে কোন রকম সাহায্যও করা হবে না। (সূরা আল বাকারা ঃ ৮৬)

اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ (আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচারণকারী) গুনাহগার লোকেরা অনন্তকাল ধরে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। (সূরা যুখরুফ ঃ ৭৪)

চির সুখের আবাস বেহেশতে এ দুনিয়ার ন্যায় নোংরা কোন বিষয় বস্তু থাকবে না। সেখানে ইজ্জত আব্রুর, জান-মালের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। থাকবে না কোন অশালীন আচরণ কথা বার্তা বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা, হত্যা, লুণ্ঠন, লুটতরাজ, খুনখারাবী, মারা-মারি হানা-হানি, বিভেদ, ঝগড়া, নৈরাজ্যপনা, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক, চিন্তা-ভাবনা বরং সেখানে বিরাজ করবে অভাবনীয় পরিবেশ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

اَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ তোমাদের কোন ভয় নেই চিন্তা নেই, তোমরা বেহেশতেরসুসংবাদ শ্রবণ কর। (হামীম সিজদা ঃ ৩০)

لاَ يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُوْنَ لاَ يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الاَكْبَرُ

বেহেশবাসীরা জাহান্নামের আওয়াজ শুনতে পাবে না। তাদের মন যা চাবে বেহেশতে স্থায়ীভাবে তা পাবে কোনরূপ ভয় বা আতঙ্ক তাদের স্পর্শ করবে

না। কুরআনে আরো বলা হয়েছে ঃ لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلاَ كِـذَّابًا
তারা সেখানে কোন অনর্থক অবাঞ্চিত মিথ্যা কথা শুনতে পাবে না। (সূরা আন-নাবা ঃ ৩৫)

لَوْ أَنزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّـنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتفَكَّرُونَ

অনুবাদ

আমি যদি এ কুরআনকে পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনীত দেখতে। আমি এ সমস্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাতে তারা চিন্তা করে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ দৃষ্টান্তের তাৎপর্য হচ্ছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্ব এবং তাঁর সমীপে বান্দার দায়িত্ব ও জবাবদিহির বাধ্য-বাধকতার কথা কুরআন মজীদে যেভাবে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে পর্বতের ন্যায় বিরাট সৃষ্টিও যদি তার সঠিক উপলব্ধি লাভ করতে পারত এবং মহান শক্তিমান আল্লাহর সম্মুখে নিজের আমলের জন্য যে তাকে জবাবদিহি করতে হবে তা যদি সে জানতে পারত তাহলে ভয়ে আতঙ্কে সে কেঁপে উঠত। কিন্তু মানুষের নিশ্চিন্ততা ও চেতনাহীনতা অধিক বিস্ময়কর। তারা কুরআন বুঝে এবং তার সাহায্যে সেসব মূলতত্ত্ব জানতে পারে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মনে ভয়ের উদ্রেক হয় না। যে বিরাট দায়িত্ব তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে তারা আল্লাহর নিকট কি জবাবদিহি করবে সে বিষয়ে এক বিন্দু চিন্তা তাদেরকে প্রকম্পিত করে না; বরং দেখা যায় কুরআন শুনে কিংবা পড়ে তা হতে তারা এক বিন্দু শিক্ষা গ্রহণ করেনি। মনে হয় তারা মানুষ নয় নিষ্প্রাণ-নির্জীব ও চেতনাহীন পাথর মাত্র। দেখা শোনা ও উপলব্ধি করা যেন তাদের কাজই নয়। মানুষের এ অবস্থা সত্যই হতাশাব্যঞ্জক।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

অনুবাদ

তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এমন মর্যাদা ও অধিকার সম্পন্ন খোদার ইবাদত করা যেতে পারে, যিনি ছাড়া খোদায়ী গুণ, ক্ষমতা ও এখতিয়ার আর কারো নেই। সৃষ্টিজগতে সৃষ্টির নিকট যা প্রকাশিত ও গোপন তাও তিনি অবগত। যা দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে তাও তাঁর নিকট স্পষ্ট। বান্দাগণ যা কিছু করে থাকে সবই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই সবকিছু করা হয়। كُلٌّ لَّهُ قَانِتُوْنَ সবই তাঁর নির্দেশের অনুগত। (সূরা আর-রাদ ঃ ২৬)

প্রত্যেকেই একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত। আর তিনি দয়াময় ও পরম দয়ালু হওয়ার কারণেই দুনিয়ার সব কিছুই নিয়ম শৃংখলার সাথে তার দয়ায় পরিচালিত হচ্ছে

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ

আমি জ্বিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। (সূরা আয-যারিয়াত ঃ ৫৬)

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنَ

হযরত মুহাম্মদ (স) যখন মক্কার কাফিরদেরকে একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তখন তারা শুধু অবিশ্বাস করত না; বরং তারা কাবাগৃহে ৩৬০ খোদার পূজায় মত্ত থাকত। সেগুলোকে তারা তাদের পৃষ্ঠপোষক মনে করত। اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَاحِدًا তারা কি বহু ইলাহ এর পরিবর্তে

اَوْ اِتَّخَذُوْا مِـنْ دُوْنِـهِ এক ইলাহ নির্মাণ করেছে? (সূরা সোয়াদ ঃ ৫)

اٰلِهَـةً لاَّ يَخْلُقُـوْنَ شَـيْئًا তারা কি এমন কিছু সংখ্যক খোদা বানিয়ে নিয়েছে যারা কিছুই তৈরী করতে ক্ষমতা রাখে না। عَـالِمُ الْغَيْـبِ

وَالشَّـهَادَةِ এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞান, হযরত সাহল (রা) বলেছেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাত সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ। কারো মতে এর অর্থ যা ঘটেছে ও ভবিষ্যতে যা ঘটবে সে সম্পর্কে প্রাজ্ঞ। কেহ কেহ বলেছেন ঃ যা বান্দাগণ জেনেছে আর যা শুনেছে ও জানেনি সে বিষয়ে অভিজ্ঞ। (কুরতুবী- ফতহুল কাদীর)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ“কে বার বার উল্লেখ করার কারণ

তিনিই আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই” এ কথাটি পূনর্বার উল্লেখ করার কারণ হলো তার প্রতি গুরুত্ব দান। কারণ, এতে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। আর এটাই হলো তাওহীদের মূলকথা। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَمَـا خَلَقْـتُ الْجِـنَّ وَالْاِنْـسَ اِلاَّ لِيَعْبُـدُوْنَ “আমি মানুষ এবং জিন্ন জাতিকে কেবল আমারই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।

الرَّحْمٰنُ ও الرَّحِيْمُ এর মধ্যে পার্থক্য

এ দু'টি শব্দ আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম। অর্থ প্রকাশের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

১. الـرَّحْمٰنُ শব্দের মধ্যে রহমতের আধিক্য রয়েছে। আর الـرَّحِيْمُ এর মধ্যে কিছুটা কম রয়েছে।

২. হযরত মুজাহিদ (র) বলেছেন, বিশ্ববাসীর প্রতি যিনি দয়া করবেন তাঁকে রহমান বলা হয়, আর রহীম বলা হয় তাঁকে যিনি পরকালে দয়া করবেন।
৩. তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, রহমান তিনি যাঁর নিকট চাওয়া হলে তিনি স্বীয় বান্দাহর চাহিদা পূরণ করেন। আর রাহীম তিনিই যাঁর নিকট চাওয়া না হলে তিনি রাগান্বিত হন।
৪. কেউ বলেন, যিনি মানুষের পাপ সমূহ ক্ষমা করেন তিনি রাহীম, আর যিনি মানুষকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করে তিনি রহমান।
৫. কেউ কেউ বলেন, যিনি মানুষকে পাপসমূহ থেকে রক্ষা করে ইবাদতের তৌফিক দান করেন তিনি রহমান, আর যিনি পরকালের বিষয়ে দয়া করেন তিনি রাহীম।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

অনুবাদ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তিময়, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতি মহিমান্বিত। তারা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

الملك। শব্দের অর্থ বাদশাহ, নিরঙ্কুশ অধিনায়ক। আয়াতে الملك। শব্দ ব্যবহার করায় তার অর্থ দাঁড়ায় তিনি কোন বিশেষ এলাকা বা নির্দিষ্ট কোন রাজ্যের বাদশা নন; বরং সমগ্র বিশ্ব জাহানের বাদশাহ। তাঁর ক্ষমতা ও শাসন কর্তৃত্ব সমস্ত সৃষ্টিজগত জুড়ে পরিব্যাপ্ত। প্রতি বস্তুর তিনি মালিক। প্রতিটি বস্তু তার ইখতিয়ার, ক্ষমতা এবং হুকুমের অধীন। তার কর্তৃত্ব তথা

সার্বভৌম ক্ষমতাকে সীমিত করার মত কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُوْنَ

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সব তাঁরই মালিকানাধীন। সবই তাঁর নির্দেশের অনুগত (সূরা আর রূম- ২৬)

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ

বাদশাহী ও সার্বভৌমত্বে কেউ তাঁর অংশীদার নয়" (সূরা ফুরকান ঃ ২)

এ সব আয়াত থেকে বুঝা যায় আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে প্রকৃত পক্ষে যা বুঝায় তার অস্তিত্ব বাস্তবে কোথাও থাকলে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাআলার বাদশাহীতে আছে। তাকে ছাড়া আর যেখানেই সার্বভৌম ক্ষমতা থাকার দাবী করা হয় তা কোন বাদশাহ্ বা কোন ডিক্টেটর ব্যক্তি সত্তা, কিংবা কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠির অথবা কোন বংশ বা জাতি যাই হোক না কেন প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। কেননা, যে ক্ষমতা অন্য কারো দান, যা এক সময় পাওয়া যায় এবং আবার এক সময় হাত ছাড়া হয়ে যায়, অন্য কোন শক্তির পক্ষ থেকে যা বিপদের আশংকা করে, আর প্রতিষ্ঠা ও টিকে থাকা সাময়িক এবং অন্য বহু প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের গন্ডি সীমিত করে দেয় এমন সরকার বা রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে আদৌ সার্বভৌম ক্ষমতা বলা হয় না। কিন্তু কুরআন মাজীদ শুধু একথা বলেই ক্ষান্ত হয় না যে, আল্লাহ্ তাআলা গোটা বিশ্ব জাহানের বাদশাহ্। এর সাথে সাথে পরবর্তী আয়াতাংশগুলোতে স্পষ্ট করে বলছে, তিনি এমন বাদশাহ যিনি কুদ্দুস, সালাম, মুমিন, মুহাইমিন, আযীম, জাব্বার, মুতাকাব্বির, খালেক, বারী, এবং মুছাওবির। (তাফহীম)

এ শব্দগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হল।

اَلْقُدُّوْسُ ঃ শব্দ আধিক্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এর মূল ধাতু قُدُسٌ- قُدُسٌ অর্থ সব রকম মন্দ বৈশিষ্ট মুক্ত ও পবিত্র হওয়া। আর اَلْقُدُّوْسُ

এর অর্থ এমন সত্তা যিনি কোনরূপ ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা, কিংবা অশোভনতা ও অসূচীতা হতে অনেক দূরে। মূলকথা হলো, আল্লাহ তাআলা সমস্ত দোষত্রুটি ও দুর্বলতা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও মুক্ত। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কুদ্দুস হতে পারে না। অন্য কাউকেও আল্লাহর ন্যায় কুদ্দুস মনে করা হলে তা হবে শিরক।

السلام ঃ অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, কাউকে সুস্থ ও নিরাপদ না বলে নিরাপত্তা বললে আপনা থেকেই তার মধ্যে আধিক্য অর্থ সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন কাউকে সুন্দর না বলে যদি সৌন্দর্য বলা হয় তাহলে তার অর্থ হবে সে আপদমস্তক সৌন্দর্যমন্ডিত। সুতরাং আল্লাহ তাআলাকে السلام বলার অর্থ তার গোটা সত্তাই পুরাপুরি শান্তিময়। কোন বিপদ, কোন দুর্বলতা, কিংবা অপূর্ণতা স্পর্শ করা অথবা তাঁর পূর্ণতায় কোন সময় ভাটা পড়া থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। (তাফহীম)

তাফসীরে কুরতুবীতে এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ

১. আল্লাহ সালাম মানে আল্লাহ তাআলা জুলুম হতে স্বীয় সৃষ্টিকে নিরাপদ ও মুক্ত রাখেন।

২. যিনি সর্বপ্রকার দোষ এবং দুর্বলতা হতে নিরাপদ ও মুক্ত।

৩. যিনি নিজের বান্দাদেরকে জান্নাতে সালাম দাতা। আল্লাহর বাণী سَلَامٌ قَوْلاً مِنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ দয়ালু প্রভূর পক্ষ থেকে সালাম পূর্ণ কথা।

৪. কেউ কেউ বলেন ঃ সালাম মানে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের শান্তিদাতা।

المؤمن এ শব্দটির মূল ধাতু হলো- آمن। আর آمن অর্থ ভয়ভীতি থেকে নিরাপদ হওয়া। তিনিই মুমিন যিনি অন্যকে নিরাপত্তা দান করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকে নিরাপত্তা দান করেন তাই তাকে মুমিন বলা হয়েছে। তিনি কোন সময় তার সৃষ্টির ওপর জুলুম করবেন, কিংবা তার অধিকার নস্যাত করবেন কিংবা তার পুরস্কার নষ্ট করবেন অথবা তার কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন এ ভয় থেকে তার সৃষ্টি পুরোপুরি নিরাপদ। আর কর্তার কোন কর্ম

অর্থাৎ তিনি কাকে নিরাপত্তা দেবেন তা যেহেতু উল্লেখিত হয়নি বরং শুধু

المؤمن। বা নিরাপত্তা দানকারী বলা হয়েছে তাই আপনা থেকে এর অর্থ দাড়ায় গোটা বিশ্ব জাহান ও তার সমস্ত জিনিসের জন্য তাঁর নিরাপত্তা। (তাফহীম)

المهيمن। শব্দের তিনটি অর্থ রয়েছে (১) পাহারাদার ও সংরক্ষণকর্তা। (২) পর্যবেক্ষক (৩) যিনি সৃষ্টি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে সদা কর্মতৎপর। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ করছেন। সবার কাজকর্ম দেখছেন এবং বিশ্বজাহানের সমস্ত সৃষ্টির দেখাশোনা, লালন-পালন এবং অভাব ও প্রয়োজন পুরনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

العزيز। এ শব্দ এমন এক মহা পরাক্রমশালী সত্তা বুঝায়, যাঁর বিরুদ্ধে কেউই মাথা জাগাতে পারে না। যাঁর সিদ্ধান্ত সমূহের প্রতিরোধ করার সাধ্য কারো নেই। যার সম্মুখে অন্য সকলেই নিঃশক্তি, অসহায় ও অক্ষম। (ফাতহুল কাদীর)

الجبار। এ শব্দটি جبر থেকে উদগত অর্থ জোর করা ও শক্তি প্রয়োগ করা। এটা হচ্ছে সংশোধনের উদ্দেশ্যে শক্তি প্রয়োগ। جبار শব্দটি মুবালিগার সীগাহ। আল্লাহ তাআলাকে جبار বলা হয়েছে। এ অর্থে যে, তিনি তার এ বিশ্বলোকের ব্যবস্থাপনা বল প্রয়োগপূর্বক যথাযথ করে থাকেন; সুস্থ, সঠিক ও সবল করে রাখেন। এ ছাড়া জব্বার শব্দের বিরাটত্ব ও মহানত্বের অর্থও নিহিত রয়েছে।

المتكبر। অর্থ বড়ত্ব প্রকাশকারী, বড়াইকারী। প্রত্যেকের বড়ত্ব প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট। তিনি কোন বিষয়ে কারো মুখাপেক্ষী নন। এ কারনেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য নিজেকে বড় মনে করা, নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা, বড়াই করে বেড়ানো। এটা মিথ্যা এবং গুনাহের কাজ।

سُبْحَانَ اللّٰـهِ عَمَّـا يُشْـرِكُوْنَ আল্লাহ পবিত্র মহান সে শিরক হতে যা লোকেরা করছে। মানুষেরা যে মিথ্যা বড়ত্বের দাবি করে এবং মিথ্যা অহমিকার প্রকাশ করে আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুনে শরিক হওয়ার দাবী করে, সে সব হতে আল্লাহ পবিত্র মহান। তাঁর সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা এখতিয়ার এবং গুনাবলিতে কিংবা তাঁর মূলত সত্তায় অন্য কোন সৃষ্টিকে তাঁর শরিকদার যারাই মনে করে, মূলতই তারা একটা অযৌক্তিক কথা বলে। (তাফসীরে কাবীর)

فَلاَ تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الاَمْثَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ

সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোনো সাদৃশ্য স্থির করো না । আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না। (সূরা নাহল ঃ ৭৪)

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْئٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা সর্ব দ্রষ্টা

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِيْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

অনুবাদ

তিনিই আল্লাহ যিনি সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকারী, আকৃতিদানকারী তার জন্য রয়েছে উত্তম নামসমুহ। আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

সূরার শেষাংশে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার কয়েকটি সিফাতী নাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, তিনি আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা, বারী, মুসাওয়ির অর্থাৎ জগতের প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টির প্রাথমিক পরিকল্পনা হতে শুরু করে বিশেষ আকার আকৃতি ও প্রকৃতিতে অস্তিত্ব স্থাপন হওয়া পর্যন্ত

সম্পূর্ণরূপে তাঁরই নির্মাণ ও লালনের অধীনে আর তা তিনটি পর্যায়ে হয়ে থাকে।

প্রথম পর্যায়ে خَلْقٌ এর অর্থ পরিমাণ নির্ধারণ, পরিমাণ নির্ণয় ও পরিকল্পনাকরণ। যেমন কোন প্রকৌশলী একটি প্রাসাদ নির্মাণের জন্য সর্ব প্রথম সংকল্প গ্রহণ করে যে, সে একটি প্রাসাদ তৈরী করবে। সংকল্প অনুযায়ী মনের মধ্যে একটি চিত্র অংকন করে এবং সে অনুসারে প্রস্তাবিত প্রাসাদের বিস্তারিত রূপ কি হবে তা সে চিন্তার রং তুলি দিয়ে মনের পর্দায় রূপায়িত করে কুরআনের পরিভাষায় এ পর্যায়ের কাজকে خَلْقٌ বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে

بـرء শব্দ এর মূল অর্থঃ ভিন্ন করা, ছিন্ন করা দীর্ঘ করা, ছিড়ে আলাদ করে দেয়া। خَالِقٌ স্বীয় পরিকল্পিত চিত্রকে কার্যকর করে যে জিনিসের চিত্র সে চিন্তা করেছে তাকে অনস্তিত্বের অন্ধকার হতে মুক্ত করে অস্তিত্বের আলোকে টেনে আনে একারনে خَالِقٌ (খালেক) শব্দ বলার সঙ্গে সঙ্গে بَارِئٌ শব্দ বলা হয়েছে এবং তা এ অর্থেই বলা হয়েছে। যেমন প্রকৌশলী প্রাসাদের যে চিত্র মানসপটে এঁকেছিল তদানুযায়ী সে যথাযথ পরিমাপ অনুযায়ী মাটির ওপর চিত্র ও রেখা অংকন করে তার ওপর মূল ভিত্তি খোদাই করে প্রাচীর বানায় ও নির্মাণ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ একের পর এক করে যায়। এটাও ঠিক তেমনি।

তৃতীয় পর্যায় হল

তাসবীর تصوير এর অর্থ আকার-আকৃতি, রচনা, এখানে এর অর্থ একটি জিনিসকে তার চূড়ান্ত রূপে বানিয়ে দেওয়া। সমস্ত সৃষ্টিজগৎকে আল্লাহ তাআলা ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি দান করেছেন যার কারনে তা

অপর একটি সৃষ্টি হতে অন্য প্রকার আকৃতি ধারণ করে এবং তা চেনা যায়। পৃথিবীর সমস্ত মাখলুকাতকে পৃথক পৃথক আকৃতি দ্বারা চেনা যায়। ইহা একমাত্র একই সৃষ্টিকর্তার পরিপূর্ণ কুদরতের বাস্তবায়ন ব্যতীত আর কিছুই নয়। (তাফসীরে জালালাইন)

لَـهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى তার জন্য রয়েছে উত্তম নাম সমুহ। এ আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলার ভালো ভালো নাম সমুহ বিদ্যমান রয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলার নাম সমূহের কোন সংখ্যা নির্ধারিতভাবে বর্ণনা করা হয় নাই। তবে হাদীস শরীফে তাঁর পবিত্র সত্তার ৯৯টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে তিরমিযী ও ইবনে মাজা এসব নাম বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এ নামেই তাকে ডাকার কুরআনে নির্দেশ রয়েছে।

وَلِلّٰهِ الاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

"আল্লাহ তাআলার জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম তোমরা তার মাধ্যমেই তাকে ডাকো।"

তোমাদের জ্ঞাত আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম সমূহের মাধ্যমে তাকে ডাকবে। বিকৃতকারীদের ব্যবহৃত বিকৃত নামের দ্বারা তাকে ডাকবে না। তোমরা যে আমল কর (ভাল-মন্দ) তার প্রতিদান তোমরা পাবে।

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

বল, তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর বা 'রহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর সকল সুন্দর নামই তো তাঁর। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১১০)

যে গুণবাচক নামে আল্লাহ নিজে নামকরণ করেছেন বা তাঁর রাসূল তাকে নামকরণ করেছেন তা ব্যতীত অন্য নামে তাকে নামকরণ করা যাবে না।

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ

অনুবাদ

আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

মুখের ভাষায় ও অবস্থার ভাষায় বর্ণনা করছে যে, তার স্রষ্টা সর্ব প্রকার দোষ-ত্রুটি অপূর্ণতা, দূর্বলতা এবং ভুল-ভ্রান্তি থেকে পবিত্র। (তাফহীম)

এ সুরা আল্লাহ তাআলার তাসবীহের আলোচনা করে আরম্ভ করা হয়েছিল। আবার তাসবীহের আলোচনার মাধ্যমে সমাপ্ত করা হয়েছে। আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ কাজ এ আয়াতের মাধ্যমে সে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

শিক্ষা

১. আল্লাহকে ভয় করতে হবে।
২. পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে।
৩. আত্ম ভোলা হওয়া যাবে না।
৪. কুরআনকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।
৫. সর্ব ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য ও তার সার্বভৌমত্ব মানতে হবে।
৬. আল্লাহর উত্তম নামের অনুসরণ করতে হবে।
৭. সদা সর্বদা আল্লাহর তাসবীহ বর্ণনা করতে হবে।

সমাপ্ত

আরজু পাবলিকেশন্স

পরিবেশনায়

ঢাকা বুক কর্ণার

৬০/ডি পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

মোবাইল : ০১৭১১০৩০৭১৬

প্রচ্ছদ

ডিজাইন বাজার/৭১৭১৯৭৫